NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Accredited by NAAC with Grade 'A'

In Celebration of

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Compendium of Special Lectures

বিশেষ বক্তৃতার সংকলন

School of Education

CF-162, Sector I, Salt Lake, Kolkata - 700064

In Celebration of
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Compendium of Special Lectures
বিশেষ বক্তৃতার সংকলন

Compiled and Formating by :

Prof. Debi Prosad Nag Chowdhury
Professor of Education, School of Education, NSOU
and
Ms. Swapna Deb
Consultant, School of Education, NSOU

School of Education
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
CF-162, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064

In Celebration of
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Compendium of Special Lectures
বিশেষ বক্তৃতার সংকলন

Published : August, 2023
প্রকাশ : আগস্ট, ২০২৩

Published by
The Registrar,
Netaji Subhas Open University,
DD 26, Sector I, Salt Lake
Kolkata - 700064
Website: www.wbnsou.ac.in

Printed at
The Saraswati Printing Works
2 Guru Prosad Chowdhury Lane
Kolkata 700 006

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
Accredited by NAAC with Grade 'A'
School of Education
CF-162, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700064

মুখবন্ধ

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ২০২২ সালে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বৎসর পূর্ণ করেছে। যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছিল, সেই স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরণ করার জন্যই ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ হল 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উদ্‌যাপন। এই উৎসবের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিতে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী মনীষীবৃন্দকে স্মরণ করাই নয়, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে জাগ্রত করা। এই বিষয়টিকে উপলক্ষ করে দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উৎসব পালন করা হয়েছে। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব্ এডুকেশন এই উৎসব পালন করেছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত বিভিন্ন মনীষীবৃন্দকে স্মরণ করার মাধ্যমে। বর্তমানে যাঁরা বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বা পূর্বে সংযুক্ত ছিলেন এমন ছয়জন প্রোথিতযশা ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতামালা দ্বারা সজ্জিত হয়েছে এই পুস্তিকাখানি। ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী জ্যোতির্ময় গোস্বামী, অধ্যাপক রাজশেখর বসু, ডঃ হরগোবিন্দ দলুই, ডঃ মাকসুদা খাতুন এবং অধ্যাপক সৌভিক মুখোপাধ্যায় তাঁদের সুচিন্তিত ও সুললিত বক্তব্যের মাধ্যমে ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, মাতঙ্গিনী হাজরা, সরোজিনী নাইডু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাবলী তুলে ধরে আমাদের ঋদ্ধ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য শ্রোতৃমণ্ডলীর মননে ও চিন্তায় নতুন নতুন গবেষণার দিক উন্মোচন করে দিয়েছে। তাঁদের জানাই আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।

আমি ধন্যবাদ জানাই নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব্ এডুকেশনের সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যাঁরা এই বক্তৃতামালাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহযোগিতা করেছেন ও বক্তৃতামালার মুদ্রিত রূপটি পাঠক মহলের কাছে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। আশা করি পুস্তিকাটি বৃহত্তর পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

ডঃ অতীন্দ্রনাথ দে
ডাইরেক্টর, স্কুল অব্ এডুকেশন
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
প্রাক্তন অ্যাডিশনাল ডি.পি.আই.,
উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Professor Chandan Basu, *Vice-Chancellor*
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
Accredited by NAAC with Grade 'A
DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064
Email:vc_nsou@wbnsou.ac.in

শুভেচ্ছা পত্র

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই হার্দিক অভিনন্দন!

উচ্চশিক্ষার বিকাশ এবং মুক্তশিক্ষার পরিসর বৃদ্ধির পরিকল্পনায় ১৯৯৭সালে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে শিক্ষাক্রমের প্রায়োগিক মেলবন্ধনের দ্বারা শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলাই ছিল মুক্ত শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায়োগিক গুরুত্বকে উর্দ্ধে তুলে ধরাই এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষার আঙিনায় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কেবলমাত্র স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষায় আবদ্ধ না থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ভিত্তিক গবেষণা কার্যের সঙ্গেও সংযুক্ত। মুক্তশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষের নিরিখে এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ২০২১ সালে ন্যাক কর্তৃক 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত। ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করার প্রয়াসে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব 'ভার্চুয়াল লার্নিং সিস্টেম' রয়েছে যা যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে শিক্ষার্থীদের শিখনের সুবিধা করে দিচ্ছে। এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের অনেকবেশী আত্মনির্ভরশীল করার উদ্দেশ্যকে যেমন চরিতার্থ করছে, তেমনি শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণকে সুনিশ্চিত করছে ও ন্যায়সঙ্গত গুণগত শিক্ষার সাথে সাথে স্থিতিশীল বিকাশের জন্য জীবনভর শিক্ষাকে প্রসিদ্ধ করছে।

উচ্চশিক্ষার রাজত্বে শিক্ষণ-শিখন কার্য্যকলাপ ব্যতীত গবেষণা, বিভিন্ন আলোচনা সভা, নানাবিধ সম্মেলন এবং কিছু বার্ষিক বক্তৃতার জন্যও নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মহান দেশ নায়ক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্মারক বক্তৃতাগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন, ভারত সরকারের স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর প্রয়াসকে মর্যাদা দিতে বিশেষ বক্তৃতা সভার আয়োজন করেছে।

ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য দিকগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা ও নতুন প্রজন্মের দেশের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা-ভালোবাসাকে উদবুদ্ধ করাই হল 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের' মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতেই স্কুল অব এডুকেশনের তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত মহান ও মহীয়সী ছ'জন ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে বিশেষ বক্তৃতামালা আয়োজিত হয়েছে। সেই ছ'জন ব্যক্তিবর্গ হলেন, ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, মাতঙ্গিনী হাজরা, সরোজিনী নাইডু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দাস। বক্তব্য রেখেছেন বিভিন্ন বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের বিশেষ বিশেষ সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গ। এই আলোচনা সভায় বক্তৃতা প্রদানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন শ্রী নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ জ্যোতির্ময় গোস্বামী, প্রফেসর রাজশেখর বসু, শ্রী হরগোবিন্দ দলুই, ডঃ মাকসুদা খাতুন এবং প্রফেসর সৌভিক মুখোপাধ্যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনে মহান ও মহীয়সী এই ব্যক্তিবর্গের অবদান সম্পর্কে প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে যে সুললিত বক্তব্য রেখেছেন তাতে আমরা সমৃদ্ধ ও মুগ্ধ। অনেক অজানা তথ্যকে আমদের সামনে তুলে ধরে গবেষণা ও চিন্তার সূত্র তৈরি করে দিয়েছেন।

আমি ধন্যবাদ জানাই স্কুল অব এডুকেশনের অধিকর্তা ডঃ অতীন্দ্রনাথ দে সহ সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গকে যাঁরা এই বক্তৃতামালাকে সাফল্যের সঙ্গে আয়োজিত করতে সংযুক্ত ছিলেন ও বক্তৃতামালার মুদ্রিত রূপটি যথার্থভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে প্রয়াস করেছেন। আশা করি পুস্তিকাটি বৃহত্তর পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

ডি ডি ২৬, সেক্টর ১, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০০৬৪
১ আগস্ট, ২০২৩

অধ্যাপক চন্দন বসু
উপাচার্য
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

Sarojini Naidu and Freedom Movement of India 09
Dr. Maksuda Khatun

সার্ধ শতবর্ষে ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ঃ তাঁর অনন্য শিক্ষাজীবন ও
দেশমাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন অংশগ্রহণ 15
ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-চিন্তার ধারায় রবীন্দ্রনাথ
শ্রী জ্যোতির্ময় গোস্বামী 33

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা 40
ড. হরগোবিন্দ দোলই

চিত্তরঞ্জন কিভাবে দেশবন্ধু হলেন তার একটি প্রাথমিক রূপরেখা 53
ড. সৌভিক মুখোপাধ্যায়

Gandhi as Mahatma in the Twenty-first Century 61
Prof. Rajsekhar Basu

Sarojini Naidu and Freedom Movement of India

Dr. Maksuda Khatun

Principal, Calcutta Girls' B.T. College

All India Radio on 15th August,1947, on the occasion of India's Independence broadcasted the rousing speeches of a lady, an ikon of India's freedom movement in the following way "Oh, world of free nations, on this day of our freedom, we greet you … It has been a struggle of heroes chiefly anonymous in their millions. It has been a struggle of women transformed into strength and power like the Kali, ... It has been a struggle of youth suddenly transfigured into power itself, sacrifice and ideals. It has been a struggle of young men and old men of the rich, of the poor, the literate, the illiterate, the stricken, the outcast, the leper and the saint. It has been the only revolution of the world history of the world … We wish to offer today our thanks to the men and women of all races who have striven for India's freedom… Today I remember those abroad who were the pioneers of our dream of freedom … We are reborn today of the crucible of our sufferings..."

Who was this personality?

She is none but Sarojini Naidu, a woman of extraordinary courage, a lovable human being, an insired orator, a renowned freedom fighter who was popularly known as 'Bharat Kokila' (The Nightingale of India). This special lecture on the occasion of celebrating of Azadi Ka Amrit Mahotsab organized by Netaji Subhash Open University, School of Education tries to highlight contribution of Sarojini Naidu towards Independence of India synoptically.

Born (1879) with a silverspoon in her mouth Sarojini chattopadhyay (daughter of Aghorenath Chattopadhyay) had everything that worldly men / women desire. Her father Aghorenath a brilliant student of presidency college secured the Gilchrist Scholarship to the study at the University of Edinburgh and also awarded a Doctorate in Science in 1877, the first Indian to be honoured. A man of multifaceted personality Aghorenath realized the value of education especially for woman. He supported whole heartedly the reformers of the time such as Ram Mohan Roy, Iswar Chandra Vidyasagar and Keshub Chandra Sen, Debendra Nath Tagore's social reforms of Bengal. Aghorenath's wife

Varada Sundari Devi shared his firm belief in one commitment of education. When Aghorenath was in Britain, Varada Sundari studied at the Bharat Ashram, an educational institution set up by Keshub Chandra Sen that offered boarding facilities as well. Both Aghorenath and Varada Sundari were initiated into the Brahmo Samaj, a movement that was opposed by orthodox and conservative people.

Aghorenath was invited to accomplish the mission Salar Jung I for modern Hyderabad. He also instrumental in setting up the girls' college and also became the Principal of the new Nizam College. Aghorenath was also fortunate in that there were already eminent educationists in the state, not just Salar Jung I but also the Nawab Imad-Ul-Mulk, which was the title given to syed Hussein Bilgrami, a renowned scholar who had moved from Lucknow at the Dewan's request to work for the cause of education in Hydrabad.

After the death (1883) of Salar Jung I Aghorenath remained devoted to the cause of education. The Indian National Congrees had just been formed in 1885 and Aghorenath used to follow its activities with great interest, though he was a person of radical political views and outspokenness.

Sarojini chattopadhyay was growing up and experiencing progressive literary cultered academic as well as political family environment what led her attaining quality education. She composes the long poem 'Mehir Muneer' and the work is published in Madras. In 1895 the Nizam awarded her a scholarship and a passage to England. She began attending king's college in London and also met the poet Edmund Gosse and W.B. Yeats. Next year she joined Girton College, Cambridge, met the poet Arthur Symons and in the same year in the month of October her book, ‘Songs by S Chattopadhyay' was published privately in Hyderabad.

Due to illness Sarojini returned to India in 1898 and thereafter married to Dr. Govindarajulu Naidu, her first love under the special Marriage Act. Within four to five years she became the mother of four children. But she continued to make public speeches. In 1905 she joined the widespread protests against the decision to partition of Bengal. This propelled her into politics. In this year a volume of her poems, 'the Golden threshold' is published in England. The content of the work showed Sarojini's love and respect to her motherland. In 1904 in Bombay for the congress session Sarojini met Ramabai Ranade, a champion of women's emancipation and education. At the 22nd session of the Indian national social conference in 1908 Sarojini Naidu was instrumental in pushing through a resolution calling for the need to educational facilities of the widows & women. She believed that true freedom would never be possible if women were not

perceived as equals to men. Sarojini spoke up tenaciously for women and for their rights. For her it was inseparable from the wider political course. She is awarded Kaiser-e-Hind gold medal by the Government of India.

Though Mohammad Ali Jinnah one of the foremost leader of Muslim league was his associate and mentor, it was Gopal Krishna Gokhale, a brilliant lawyer and pioneer of compulsory Primary Education in India who initiated Sarojini into politics and soon she was working in close collaboration with the most important political leaders of the time, Specially with M. K. Gandhi who supposed to Political Guru of Sarojini and she became a spokesperson for important issues for the cause of her motherland. Sarojini was continually associated with Gandhi. The epithets 'apostle of peace,' 'Mystic Spinner' 'Micky mouse', 'Little Man', 'Beloved Pilgrim' are coined by Sarojini to MK Gandhi during her different speeches resolutions and letters. Sarojini met Gandhi on 8th August, 1914 in London for the first time. In 1915 both her father and Gokhale passed away. She wrote a moving tribute to Gokhale in Bombay Chronicle.'

During the priod 1915-1918 Sarojini Naidu travelled across India and continuously spoke on social issues, matters of welfare, women empowerment, emancipation and nationalism. Inspired by Gandhi she extended her help and support to the indigo workers in champaran who were being subjected to violence & oppression. Sarojini also was well versed in Bengali English Urdu persion language. She wrote a biography of Mohammad Ali Jinnah titled 'The Ambassador of Hindu-Muslim Unity.' On the same year (1916) she met Jawaharlal Nehru at the Lucknow Congress session …….

On 13th April 1919, the Jallianwala Bagh Massacre in Amritsar shook every Indian. This saw soldiers, led by Brigadier-General Resinald Dyer, Shooting down several hundred unarmed people who had gathered to protest peacefully against the draconian Rowlatt Act, a law that sought to curb essential freedoms and gave the police the right to arrest and detain anyone they suspected. However, a report commissioned by the viceroy Lord Chelmsford absolved Dyer of any wrongdoing. Sarojini Naidu travelled to London to persuade the government to look at the Indian National Congress's own findings into the Jallianwala Bagh Massacre. In a speech in London's Kingsway hall, Sarojini was fiercely critical of the many atrocities that women to Punjab in particular had been subjected to, due to the Rowlett Act. It was the British response to the measure and other harsh measures including the Rowlatt Act that turned her finally and resolutely against the British in every way. Her letters with Gandhi and correspondence between Mr. Montagu (through his secretary Mr.

Brown) bear eloquent testimony to this fact.

Sarojini Naidu as part of WIA (Women's Indian Association) argued along with Annie Besant for representation for women in the new legislative bodies being planned under the Govt. of India Act of 1919, also called the Montagu-Chelmsford Reforms. This reforms recommended that provincial legislatures, which were soon to be set up would also have the power to grant women the right to vote which Sarojini probably conceived as the pre-requisition of attaining freedom.

A public meeting of the citizens of Madras was held on 17th March 1919 to urge on the Government to drop the Rowlatt Bills and to express its unqualified adherence to Mr. Gandhi's Satyagraha Movement. Sarojini Naidu moved the resolution mentioning revolutionary approach of Mazzini, Gariboldi Kossuth and the progressive poets of Shelley, Byron, Milton Sarojini emphasized upon India's freedom and said ''May I India for your liberty give my life and for your honour ……. Let rhetoric upon rhetoric and memorials of protest flow to the wide sea that brings up the waves of Bills which answers nothing''. Truly say this is the strong determination of Sarojini Naidu.

It bears an eloquent testimony to the fact that there lies every spirit of Swadeshi in Sarojini Naidu when we notice the content of Trivandrum speech delivered by Sarojini on Sunday, 18th October 1922. To quote Sarojini "…… without the solution of that economic degradation and slavery of India, it is hopeless to talk of freedom at all …… let their be khadi through India - not the khadi as coarse as this table cloth nor handspun khadi exactly like this (gesturing to the cloth she was wearing), but only the symbol of the swadeshi spirit which is the only symbol that a free Indian nation can possess …….. the great act of spinning which you know was crushed because of the economic interest of Lancashire. You know (audience) that terrible story of the fine silk of Mursidabad, the beautiful mull and the Dacca muslin, whose fine texture and variety of color and design were exterminated. The looms and even the fingers of the manufacturers were cut off and crushed".

In another part of her speech Sarojini Naidu said"…… it is not against our own Governments …….. but it is against the spirit of alien administration which has no right in any land." According to her the swadeshi spirit covers literally all the many manifestations of the movement (Great Satyagraha Movement). Through her speech she tried to expand spirit of swadesi to the entire nation of India.

Sarojini Naidu stressed npon unity of the whole nation. She said "To be national a united people might make great united contributions to the national wealth of world." Another important role played by Sarojini Naidu towards the independence of India is her active participation and leadership in Civil Disobedience Movement. As Sarojini Naidu became more involved with the congress, she was also one of Gandhi's closest associates. In March, 1930 when Gandhi announced the civil Disobedience Movement by launching Salt Satyagraha, a protest against a monopoly of the Salt Laws, Gandhiji was soon arrested. On 5th May the leadership of the movement fell to Sarojini. She with several thousand volunteers, attempted to enter the Dharasana Salt works near Dandi just as Gandhi had intended. Sarojani accompanied some other close associates of M K Gandhi whose name need to be mentioned. They are Imam Saheb of the Sabarmati Ashram, Pyarelal Nayyar, Narhari Parekh and Gandhi's son Manilal. The weather was extremely hot and dry. Consequently the volunteers were soon terribly thirsty. The police had surrounded them on all sides and beat them violently as they came in waves, nearer and nearer the gates. Shorojini addressed the volunteers, prayed with them, spun khadi and wrote. By mid May she was addressed, with all other volunteers. She told her daughter, Leelamani, from jail, 'Remember the darkness holds the light within'.

Gandhi embarked on fasts often, as a sign of protest, and over the years these took a toll on his frail health. This became an immense cause of worry for his associates, including Sarojini. Most time she would join him and pray silently for his long life. She was by his side on 20th September 1932 when Gandhi embarked on his fast against the provision of separate electorates for the lower castes as per the 'communal award' offered by the British in 1932.

Another most important activity in respect of freedom struggle movement played by Sarojini Naidu which is noteworthy. Sarojini suffered frequent terms of imprisonment in her long involvement in the nationalist cause, one where she always marched in Gandhi's footsteps. The lengthiest incarceration she served was soon after the Quit India resolution had been passed on 8th August 1942. She was imprisoned in the Aga Khan Place in Poona along with Mahatma Gandhi and his wife Kasturba. It was here that Kasturba Gandhi died of a long fever. Sarojini who was suffering from malarial fever too was released in March 1943. She sailed to London with other delegates for the Round Table Conference.

Sarojini Naidu was appointed as the President of the Indian National Congress, the first Indian Woman and she chaired the special session of the

Indian National Congress when Rajendra Prasad was elected president after the resignation of Subhas Chandra Bose.

Amidst the multifarious political and social activities this personality passed away on 2nd March 1949 after the assassination of her Guru Gandhiji. Pandit Jawaharlal Nehru in his broadcast to the nation said: "The captains and kings of my generation depart, old friends and dear comrades pass away, and now the dearest and brightest of them is gone. I feel desolate of heart and willowed in spirit. Though Sarojini Devi's strength ebbed out, her indomitable spirit held aloft. Men and women of this country, have you the spirit to carry the torch and hold it aloft? May it be given to us to give India what she gave."

In conclusion we can say that the life-long works and role of Sarojini Naidu towards the freedom struggle of India are immense. It's not possible to highlight all the activities of Sarojini in a single special lecture. Her variegated personality specially the lecture delivered in different public meetings and activities in relation to India's freedom movement needs to be revisited by the present day scholars and researchers. After independence Sarojini Naidu is first made acting governor of the Uttar Pradesh and then she continued as Governor of the state. She was the first woman to serve as Governor of a state. Though she is a forgotten name today yet it must be and should be vehemently admitted that Sarojini Naidu is relevant in the light of present day situation specially when we review the very important lectures of Naidu entitled 'True Brotherhood', 'The Education of Indian Women', 'Co-operation Among Communities', 'Hindu Muslim Unity', 'Women in national Life etc.' From this platform, during the celebration of Azadi ka Amrit Mahotsab we convey our heartfelt salute to this peace loving patriot of our nation.

Reference :

1. Smt. Sarojoni Naidu, Loksabha Secretariat New Delhi, 2019.
2. Essential Reader, Sarojini Naidu, Penguin Random house India Pvt. Ltd. 2022 introduction by Makarand R. Paranjape.
3. Sarojini Naidu, The Nightingale and the freedom fighter, edited by Anu Kumar, 2014.
4. Samsad Bangalee Charitabhidhan, Subodh Chandra Sengupta, 1976.
5. Wikipedia.
6. Britannica.

সার্ধ শতবর্ষে ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ঃ তাঁর অনন্য শিক্ষাজীবন ও দেশমাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন অংশগ্রহণ

ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার প্রাপক এবং ভূতপূর্ব শিক্ষক,
চারঘাট মিলন মন্দির বিদ্যাপীঠ, উত্তর চব্বিশ পরগণা

পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে দেশবাসীর প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করে যিনি তাঁর ব্যক্তিগত সুখ ও শান্তি জলাঞ্জলি দিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি হলেন যোগব্রতী শ্রীঅরবিন্দ। অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারকে এদেশে থেকে উৎখাত করতে যিনি দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত করার লক্ষ্যে গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, সেই বিপ্লবী মনীষীর জন্মের সার্ধ শতবর্ষের এই পুণ্যলগ্নে ভারতের স্বাধীনতা লাভের ৭৫-তম বর্ষে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের যে দুর্লভ অবদান ছিল তা আমরা এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করব।

শ্রীঅরবিন্দের অনন্য জীবনবৃত্তকে আমরা ৫টি পর্বে বিভক্ত করি। (১) শৈশব পর্ব (১৮৭২ সাল থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত, ৭ বছর)। (২) বিলেতের শিক্ষা পর্ব (১৮৭৯ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত, ১৪ বছর)। (৩) বরোদায় চাকুরি পর্ব (১৮৯৩ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত, ৪ বছর)। (৪) চন্দননগরে নিভৃত সাধন পর্ব ও পণ্ডিচেরিতে জীবনের যোগসাধন পর্ব (১৯১০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত, ৪০ বছর)।

শ্রীঅরবিন্দ ১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ হুগলির কোন্নগর থেকে কলকাতার থিয়েটার রোডের বাড়িতে এসে বসতি স্থাপন করেন। সেই আমলে তিনি একজন বিলেত ফেরৎ সরকারি চিকিৎসক ছিলেন। আর তাঁর মা ছিলেন মনীষী রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতা দেবী। পিতার মাত্রাতিরিক্ত সাহেবিয়ানার জন্য তিনি শৈশবে শ্রীঅরবিন্দকে কখনও মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলতে দিতেন না। সেজন্য বাড়িতে তাঁকে নিত্য পরিচর্যার জন্য মিস প্যাগিট নামে এক ইংরেজ সেবিকাকে কৃষ্ণধন নিয়োগ করেছিলেন। এর ফলে সেই বয়সে তিনি ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে শিখেছিলেন। তবে বাংলা ভাষায় তাঁর ন্যূনতম কোন ধারণা ছিল না। জন্মের ৫ বছর পর তাঁকে দার্জিলিঙের লরেটো কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। আইরিশ নানদের দ্বারা পরিচালিত সেই স্কুলের বোর্ডিং-এ ইউরোপীয় সহপাঠীদের সঙ্গে থাকার ফলে শ্রীঅরবিন্দ সেখানাকর দু'বছরের শিক্ষাজীবনে তাঁর বেশভূষা, চালচলন ও আচার-আচরণে পুরোদস্তুর ইউরোপীয়

শিক্ষার্থীদের মত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই কনভেনট স্কুলের দু'বছরের শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করে শ্রীঅরবিন্দ ৭ বছর বয়সে ১৮৭৯ সালের মে মাসে বিলেত যাত্রা করেন। আর সেই বিলেতে তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়েছিল ১৪ বছর। অবশেষে ১৮৯৩ সালে তিনি ২১ বছর বয়সে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে সেখানে ভারতীয় শিক্ষায় নয়, পরিপূর্ণ ইউরোপীয় শিক্ষায় তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ একান্তভাবে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। বিলেতের ম্যানচেস্টারে প্রথম ৫ বছর এক পাদরি শিক্ষক মি. অ্যাক্রয়েড ও তাঁর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে তাঁদের বাড়িতে অবস্থান করে শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষালাভ করেন। উল্লেখ করা যায় যে, কৃষ্ণধনের একান্ত প্রিয় বান্ধব ছিলেন তৎকালীন রংপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মি. গ্লেজিয়ার সাহেব। আর তাঁর আত্মীয় ছিলেন এই অ্যাক্রয়েড পরিবার। কালক্রমে সেই পরিবারের সঙ্গে কৃষ্ণধনেরও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মি. অ্যাক্রয়েড শ্রীঅরবিন্দকে প্রথমে ল্যাটিন ও ইংরেজি ভাষা শেখান। আর তাঁর স্ত্রী তাঁকে শেখান ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত ও ফরাসি ভাষা। শ্রীঅরবিন্দ সেই পরিবারে অবস্থান করে বেশির ভাগ সময় অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন। ইতিমধ্যে বাইবেল, শেক্সপিয়রের গ্রন্থ ছাড়া তিনি শেলি, কীটস প্রমুখ কবির অনেকগুলি গ্রন্থ আয়ত্ত করেন। সেখানে ৫ বছরের অধ্যয়নের পর্ব সম্পন্ন করে শ্রীঅরবিন্দ ১৮৮৪ সালে লন্ডনের সেন্ট পলস স্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। সেই স্কুলে প্রায় ৬ বছর অর্থাৎ ১৮৮৪ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত একটানা অধ্যয়ন করেছিলেন। সেখানে ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ গ্রীক ভাষাও অধ্যয়ন করেন। সেই স্কুলে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ অতিরিক্ত মেধার পরিচয় দেওয়ার স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে দ্রুত উচ্চ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করে দেন। সেই স্কুলে অধ্যয়নের শেষ ৩ বছর তিনি ইংরেজি সহ ইউরোপীয় আরও কয়েকটি ভাষা ও ইতিহাসচর্চায় মগ্ন হয়ে যান। শ্রীঅরবিন্দ ইতিমধ্যে ল্যাটিন, ইংরেজি, গ্রীক, ফরাসি ভাষা ছাড়াও ইটালীয়, জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বলা যায়, মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি ৭টি ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন। ভাষা ছাড়া তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল সাহিত্য ও ইতিহাস। এরই মধ্যে তিনি স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এর ফলে তিনি বার্ষিক ৮০ পাউন্ড মূল্যের একটি উচ্চমানের বৃত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য এবারে তিনি সরাসরি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হন। এরই মধ্যে পিতা কৃষ্ণধন ঘোষের কাছ থেকে পাওয়া চিঠির মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ দেশপ্রেমের ভাবনায় সবিশেষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসকদের নিপীড়ন ও অত্যাচারের কথা কৃষ্ণধন তাঁর পুত্র শ্রীঅরবিন্দকে সবিস্তারে প্রায়শ অবহিত করতেন। এরই জন্যে তাঁর মনে প্রায়ই তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত। পিতার পত্র মারফৎ জীবনে সেই প্রথম তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসিত এক হতভাগ্য পরাধীন দেশ। সেই থেকে তাঁর মনের মধ্যে একটি যন্ত্রণাবোধ প্রায় জেগে উঠত। এজন্য তিনি ভাবতেন যে, তাঁর মাতৃভূমির মুক্তির জন্য একদিন তাঁকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে। তাছাড়া, মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করাই হবে তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত। এমনকি, দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তিনি

তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন। সেই ১৪/১৫ বছরের এক কিশোর বালকের এই জীবনব্রতের কথা শুনে সকলে অভিভূত হতেন। বিশ্বের ইতিহাস অধ্যয়ন করে তিনি জেনেছিলেন যে, বিশ্বের সকল সভ্য দেশই স্বাধীন। তবে একমাত্র তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখনও পরাধীন। তিনি সেইসময় ফ্রান্স, ইটালি ও আমেকিার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা জেনেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দ লন্ডনের অধ্যয়নপর্ব সম্পন্ন করে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে প্রবেশ করেছিলেন। ১৮৯০ সালে তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। আর সেই সময় থেকে দেশজননীকে স্বাধীন করার স্বপ্ন তাঁর তীব্রতর হয়েছিল। কিংস কলেজে তিনি একটানা ২ বছর অধ্যয়ন করেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, লন্ডনের সেন্ট পলস স্কুলের অধ্যয়নপর্ব সম্পন্ন করে তাঁর পিতার পরামর্শে তিনি আই.সি.এস. পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। অন্যদিকে, কিংস কলেজের পাঠ্য বিষয়ের চাপের মধ্যে থেকেও তিনি ১৮৯২ সালে আই.সি.এসে. পরীক্ষা দিয়ে যথারীতি সাফল্য লাভ করেন। তবে চূড়ান্ত পর্বের অশ্বারোহণ করার ব্যবহারিক পরীক্ষায় তিনি সফল হতে পারেননি। এরপর সেই চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষায় তাঁকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার উপস্থিত হতে বললেও তিনি আর উপস্থিত হননি। সেইসময় কলেজে প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় কাব্য রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। সেই সময় ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় পরীক্ষা দিয়েও তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন। তাঁর স্নাতক পর্যায়ের প্রথম বর্ষের ফল দেখে অধ্যাপকেরা অভিভূত হন। দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষায় উপস্থিত না হওয়ায় স্নাতক হওয়ার সৌভাগ্য থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। মূলত আই.সি.এস ও স্নাতক পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্বে তিনি উপস্থিত না হওয়ার উভয় ক্ষেত্রে অসফল হয়েছিলেন। এর ফলে সেই মুহূর্তে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আসলে দেশমাতৃকারা পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে তখন প্রতিক্ষণ দগ্ধ করত। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, কিংস কলেজের ভারতীয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত 'ভারতীয় মজলিশ'-এ তিনি অধিকাংশ সময়ে যুক্ত থাকতেন। জাতীয়তাবাদী ভাবনায় বিভোর হয়ে সেখানকার ভারতীয় শিক্ষার্থীরা ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা পোষণ করতে শুরু করেন। অনতিবিলম্বে শ্রীঅরবিন্দ এই সংগঠনের সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। কলেজের ভারতীয় শিক্ষার্থীরা তখন মাতৃভূমির দুর্দশা মোচনে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দও সেই সংগঠনের সভা-সমাবেশে দেশ জননীর পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখতেন। ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতবর্ষে গিয়ে সেই দেশের মানুষকে নিপীড়ন ও অত্যাচার করছে আর ভারতীয় শিক্ষার্থীরা সেই দেশ থেকে বিলেতে এসে আরামদায়ক জীবন উপভোগ করেছেন—এটা কোনভাবেই মানা যায় না। তাই, শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশে ফিরে গিয়ে বিদ্রোহ শুরু করবেন বলে প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন। 'ভারতীয় মজলিশ'—এর সব কথা ইতিমধ্যে ইংরেজদের কাছে চলে গিয়েছিল। তাই, অবশেষে কিংস কলেজ থেকে লন্ডনে ফিরে গিয়ে ১৮৯২ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীঅরবিন্দ লন্ডনে বসবাসকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত এক গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। সেই গুপ্ত সমিতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিপ্লবীরা ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসকদের শীঘ্রই

অপসারিত করবে। সেই সময় ভারতীয়দের অভিমত ছিল যে, শ্রীঅরবিন্দ একজন সফল আই.সি.এস হলে হয়তো একজন সার্থক রাজকর্মচারী হতেন। কিন্তু তাতে তাঁর দেশবাসী একজন দেশপ্রেমিক, যোগসিদ্ধ মনীষী ও বিশ্বখ্যাত দার্শনিককে হারাতেন। সেই মুহূর্তে কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁর পুত্র শ্রীঅরবিন্দকে অবিলম্বে স্বদেশে ফিরে আসার পরামর্শ দেন। তখন তিনি জীবন-জীবিকার স্বার্থে স্বদেশে একটি কাজের সন্ধান করছিলেন। সেই সময় বরোদার রাজা গায়কোয়াড় বিলেতে গিয়ে তাঁর সরকারের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করছিলেন। রাজা গায়কোয়াড় তাঁর এক বন্ধু জেমস কটনের কাছ থেকে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত হয়ে তখনই তাঁকে তাঁর সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীঅরবিন্দ বিলেত থেকে বরোদায় গিয়ে একজন রাজকর্মচারী হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর২১ বছর বয়সে সেই চাকুরিতে যোগ দিয়ে তিনি একাদিক্রমে ১৩ বছর সেখানে কর্মরত ছিলেন। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯০৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ বরোদারাজের অধীনে কাজ করছিলেন। এদিকে বিলেত থেকে এদেশে পৌঁছানোর পূর্বে তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষের আকস্মিকভাবে জীবনাবসান হয়েছিল। জানা যায়, বিলেতের একটি ব্যাঙ্ক থেকে তাঁর কাছে একটি টেলিগ্রাম আসে। তাতে বলা হয়েছিল যে, বিলেত থেকে শ্রীঅরবিন্দ যে জাহাজে করে স্বদেশে যাচ্ছেন সেটি মাঝপথে জলমগ্ন হয়েছে। এই সংবাদ তিনি পুত্রের অনিবার্য মৃত্যু হবে জেনে অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। কিন্তু যে জাহাজটি জলমগ্ন হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ তাতে না উঠে পরেরটিতে উঠেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কৃষ্ণধন ঘোষ প্রকৃত ঘটনাটি জানতে পারেননি!

শৈশবকাল থেকে শ্রীঅরবিন্দের কাছে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল। তবে ইউরোপীয় দেশগুলির স্বাধীনতালাভের ইতিহাস জেনে তিনি অতিশয় উদ্দীপিত হতেন। তবে উন্নত দেশগুলিতে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটলেও রাশিয়ায় কিন্তু তা হয়নি। বাধ্য হয়ে সে দেশের স্বেচ্ছাচারী জার সরকারের বিরুদ্ধে তখন দেশবাসী গুপ্ত সমিতি গঠন করে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। সেখানকার স্বাধীনতাকামী মানুষের আত্মত্যাগের কথা জানতে পেরে শ্রীঅরবিন্দ সবিশেষ উদ্দীপিত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, তৎকালীন যুগে বিশ্বের নানা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জেনে তাঁর মনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। ধর্মভাব ও আত্মত্যাগের পাশাপাশি তখন তাঁর মনে নিঃস্বার্থ জীবনচর্যার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষে পদার্পণ করে এদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন ভাবধারা প্রবর্তন করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের সর্বত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে তিনি গুপ্ত সমিতি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পূর্বে বলা হয়েছে যে, পিতার কাছ থেকে তথ্য জেনে তিনি ভারতবর্ষের দুর্দশা মোচনে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। বৈদেশিক ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার ও নিপীড়নে এদেশের মানুষের তখন নাভিশ্বাস উঠেছিল। পরাধীনতার যন্ত্রণা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে শ্রীঅরবিন্দ সেই মুহূর্তে দেশজননীর মুক্তির জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে

সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। একদা নাস্তিক জড়বাদী থেকে ঈশ্বরবিশ্বাসী যোগীপ্রবর হয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দেশমাতৃকাকে দেবী মহামায়া রূপে বরণ করেছিলেন। তখন তাঁর চিন্তায় পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও ভারতের ব্রহ্মতত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয় সৃষ্টি হয়েছিল। ৭ বছর বয়স থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর এই দীর্ঘ ১৪ বছর একটানা বিলেতের শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করে তিনি দেশজননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত ছিল ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই দীর্ঘ ১৪ বছর বিলেতের শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় আহরণ করে মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেইসময় এদেশে এসে শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন করতে শুরু করেন। সেই বছর গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়দের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রতিবাদের অস্ত্র ছিল সত্যাগ্রহ, অসহযোগ ও অহিংসা আন্দোলন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় গান্ধীজির সেই প্রতিবাদ আন্দোলনের সংবাদটি প্রকাশ করলে তাতে ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়েছিল। বিলেত থেকে শ্রীঅরবিন্দ এদেশে এসে প্রথম পদার্পণ করেন বোম্বাইয়ে। সেখানে নেমে তাঁর মনে বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছিল এবং সেইগুলি পরবর্তীকালে তাঁর দর্শন ও যোগ-জীবনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯০৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত তিনি বরোদার রাজসরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ২১ বছর বয়স থেকে ৩৪ বছর বয়স পর্যন্ত মোট ১৩ বছর তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন। বরোদা সরকার তাঁকে প্রথমে রাজস্ব বিভাগে নিয়োগ করেছিল। তারপর সরকারি চিঠিপত্রে মন্তব্য লিখন, রাজার সচিব, রাজার ভাষণলিপি প্রস্তুত প্রভৃতি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পর এবার তাঁকে শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। শিক্ষাবিভাগে যোগ দেওয়ার পূর্বে তিনি কিছুদিন বরোদা কলেজে ফরাসি ভাষায় অধ্যাপনা করেন। তারপর স্থায়ীভাবে শিক্ষাবিভাগে যুক্ত হওয়ার পর তাঁকে কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বরোদা কলেজের সহকারি অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও শ্রীঅরবিন্দ এদেশে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় বিশেষ মনোযোগী হন। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করে অজস্র মণি-মাণিক্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন। মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকটিকে তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তাছাড়া, গীতা, উপনিষদ ও বেদের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি তো তাঁর একদা আকরগ্রন্থের সমাদর লাভ করেছিল। সর্বোপরি, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসমূহের সঙ্গে সেইসময় তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ সৃষ্টি হয়। বরোদা থেকে পরবর্তীকালে পণ্ডিচেরিতে গিয়ে তিনি মূল বেদাদি গ্রন্থ অর্থাৎ ঋক্‌বেদ সহ অন্যান্য বেদের সংহিতাভাগ গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর 'দ্য লাইফ ডিভাইন' গ্রন্থে বেদের সংহতিভাগ থেকে তিনি অনেকগুলি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। বরোদায় গিয়ে বাংলা ভাষা শেখার তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল। তবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে শিক্ষানবিশি পর্যায়ে তাঁকে ভারতের একটি প্রাদেশিক ভাষা তথা বাংলা ভাষা জানতে

হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের পিতৃবন্ধু স্যার হেনরি কটনের অনুরোধে ভারতের একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ জজ মি. টাওয়ার সাহেব তাঁকে বাংলা ভাষা শিখিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ অবশেষে সিভিল সার্ভিসে গৃহীত না হওয়ায় তাঁর আর বাংলাভাষা শেখা সেই পর্যায়ে সম্ভবপর হয়নি। তবে বিলেতে থাকাকালীন তাঁর নিজের ইচ্ছায় বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি গ্রন্থ তিনি সাগ্রহে অধ্যয়ন করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এদেশে ফেরার পর ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনাবসান হলে তিনি 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তাঁর স্মৃতিতে ৭টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৪ সালের ১৬ই জুলাই। শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা শেখাবার জন্য তাঁর মাতুল তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট লেখক দীন্দ্রেকুমার রায়কে ১৮৯৮ সালে দু'বছরের জন্য বরোদায় পাঠিয়েছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার তাঁকে বাংলা কথ্য ভাষা শেখাতেন। তাঁর বাংলায় লেখা 'কারাকাহিনি' গ্রন্থ ছাড়াও তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে এলে বাংলায় লেখা তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ 'ধর্ম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বরোদায় থাকার সময় তাঁকে গুজরাটি ও মারাঠি ভাষাও শিখতে হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের রচিত গ্রন্থগুলি তিনি নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন। সময় পেলে কাজের অবসরে শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখতেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সাবিত্রী' বরোদায় থাকার সময় লিখতে শুরু করেছিলেন আর তা মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে শেষ করেন। রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি ইংরেজি কবিতাও লিখেছিলেন। তাছাড়া, তাঁর 'দ্য মাদার' গ্রন্থখানি চণ্ডীতত্ত্বের সুললিত ব্যাখ্যা বলে অনেকে মনে করেন। জ্ঞানতাপস শ্রীঅরবিন্দের জীবনযাত্রা ছিল অতি সরল বৈদগ্ধ্যে পূর্ণ। তাঁর প্রাত্যহিক চালচলনছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। তাতে মোটেই বিলেতের ছায়া থাকত না। তিনি বরাবর পুষ্টিকর খাদ্য খেতেন। তবে তা কখনই রুচিকর হত না। আসলে তিনি কখনই বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। বরোদায় অবস্থানকালে শ্রীঅরবিন্দ যশোরের অধিবাসী ও উচ্চপদস্থ একজন রাজকর্মচারী ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পরে অবশ্য মৃণালিনী দেবী স্থায়ী ভাবে রাঁচিতে বসবাস করতেন। ১৯০১ সালে বিবাহের সময় শ্রীঅরবিন্দের বয়স ছিল ২৯ বছর আর মৃণালিনী দেবীর বয়স ছিল ১৪ বছর। শ্রীঅরবিন্দ শক্তি ও ব্রহ্মতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দুধর্মের আচার মেনেই তাঁদের বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। বিবাহের পর বেশ কিছুকাল তাঁরা স্বামী-স্ত্রী একত্রে বরোদাতে ছিলেন। তারপর অবশ্য পত্রালাপের মাধ্যমে যোগসূত্র রক্ষা করা হত। সেইসময় শ্রীঅরবিন্দ বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ায় তাঁর বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকত না। স্ত্রীকে উপেক্ষা করা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। বরং তাঁকে তিনি একান্ত সহযোগিনী হিসেবে কাছে পেতে চাইতেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর লেখা 'বঙ্কিম-তিলক-দয়ানন্দ' শীর্ষক একটি পুস্তকে 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানদলের সঙ্গে স্বাধীনতাসংগ্রামীদের তুলনা করেছিলেন। সংগ্রামীরা হবেন বৈরাগী তথা সন্ন্যাসী। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশজননীকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তাঁরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছ থেকে দূরে থাকবেন। শ্রীঅরবিন্দ সন্তানদলের আদর্শ অনুসরণ করতেন। বিবাহের মাত্র ৯ বছর পর শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চিরতরে কলকাতা শহর পরিত্যাগ করেছিলেন।

তারপর থেকে তাঁরা আর কেউ কাউকে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। তবে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্ত্রীকে ১৯১৮ সালে পণ্ডিচেরিতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেইসময় হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃণালিনী দেবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩১ বছর। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরিতে যাওয়ার পর থেকে মৃণালিনী দেবী প্রায়শ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর সান্নিধ্যে গিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন।

ভারতের জাতীয় জাগরণে শ্রীঅরবিন্দের মূল্যবান অবদানকে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বিশেষত, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দশকে জাতীয় আন্দোলনের প্রধান নেতা শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা জাতির জীবনকে মহিমান্বিত করেছিল। দেশবাসীকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দেশজননীকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার শক্তি ও সাহস তাঁরা সঞ্চারিত করেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৬১ সালে মনীষী রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা' ও ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা'-র মধ্য দিয়ে এদেশে জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শ প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। এর পূর্বে ১৮৭৬ সালে কলকাতায় 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠা করতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারপর ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে সর্ব ভারতীয় একটি জাতীয় সংগঠন 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এরই মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ মনীষী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৯৪ সালে ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাবসান হয়েছিল ১৯০২ সালে। ইতিমধ্যে ১৮৯৩ সালে বিলেতের শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করে বরোদায় পৌঁছে এখানে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ গড়ে তুলতে শ্রীঅরবিন্দ ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। এরপর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশি আন্দোলন সংগঠিত করতে শ্রীঅরবিন্দ কার্যত অগ্রনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তনের ৬ মাসের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ 'নিউ ল্যাম্পস ফর ওল্ড' নামে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলেন। তাঁর কেম্ব্রিজের সহপাঠী কেশবরাও দেশপাণ্ডে সম্পাদিত একটি অ্যাংলো-মারাঠা পত্রিকা 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ পুণা থেকে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ একই শিরোনামে ঐ পত্রিকায় তাঁর আরও ৭টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বরোদার রাজকর্মচারী হওয়ায় তিনি সেগুলি বেনামে লিখতেন। এইসব লেখার মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য, কর্মপন্থা ও গঠন পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করতেন। কংগ্রেসকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত করতে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন। কেননা, কংগ্রেস সেই মুহূর্তে ব্রিটিশ সরকারের কাছে দেশের সংস্কারমূলক কিছু নিছক কর্মসূচি রূপায়ণের দাবি জানাচ্ছিল। কিন্তু দেশমাতৃকার পরাধীনতার গ্লানি দূর করে কিভাবে দেশে স্বাধীনতা আনয়ন করা যায় তার জন্য তাদের কাছে জোরালো কোন দাবি ছিল না। সেইসময় বছরে একবার বড়দিনের ছুটির মধ্যে কংগ্রেসের উদ্যোগে ৩/৪ দিনের এক অধিবেশনের আয়োজন করা হত। সেই অধিবেশনে বড় জোর দেশের উন্নয়নমূলক

বা সংস্কারমূলক কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করাহত। সেই প্রস্তাবগুলি সরকারের কাছে পেশ করা হলে দলের কাজ তখন কার্যত শেষ হয়ে যেত। বলাবাহুল্য, সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনমূলক প্রস্তাব পেশ করাই ছিল দলের একমাত্র কাজ। দেশের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিমূলক ব্যক্তিবর্গ তখন কংগ্রেসের কর্মসমিতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারতেন না। কতিপয় শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষদের নিয়ে সেইসময় কংগ্রেসের কর্মসমিতি গঠন করা হত। বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব না থাকলে এই সংগঠন যে কোনদিন জাতির স্বার্থে কোনপ্রকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত করতে পারবে না—একথা দেশহিতৈষী প্রতিটি মানুষের মুখে তখন উচ্চারিত হত। এই পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কংগ্রেসের সংযোগ স্থাপিত হলে তবে দেশবাসীর সার্বিক কল্যাণে তাঁরা অংশ নিতে সমর্থ হবেন। সাধারণ মানুষ যুক্ত হলে তবেই কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সফল করতে পারবে বলে শ্রীঅরবিন্দ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, জনসংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সার্থক হবে। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশমাতৃকার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জোরদার করতে পারলে দেশ স্বাধীনতা লাভ করবেই। 'ইন্দুপ্রকাশ'-এর লেখা নিয়ে তাঁর সঙ্গে রানাডে ও তিলকের নিয়ত মত বিনিময় হত। 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ তাঁর শেষ রাজনৈতিক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি। সেটি ছিল তাঁর ৮ম প্রবন্ধ। এরপর ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হলে তিনি ঐ পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর পর পর ৭টি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সে-বছর জুলাই মাসে তাঁর প্রথম লেখাটি প্রকাশিত হয়। তারপর ৭ম তথা শেষ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় সেই বছরের আগস্ট মাসে। সেইসব প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা, কর্মজীবন, সাহিত্যসাধনা, দেশের জন্য মূল্যবান অবদান এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর অনুকরণে শ্রীঅরবিন্দ 'ভবানী মন্দির' নামে একটি আশ্রমের পরিকল্পনা করেন। বরোদা ত্যাগের পূর্বে তিনি এ-নিয়ে একটি পুস্তিকাও লিখেছিলেন। দেশসেবকদের কাছে সেটি একটি সাধনার কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। মূলত বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে মাতৃরূপে পুজো করতে দেশবাসীকে শিখিয়েছিলেন। তাই, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তার ভিত্তি ছিল ধর্ম। অনুরূপভাবে, শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তার ভিত্তিও ছিল সেই ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র তো তাঁর দেশকে মাতৃরূপে নিরন্তর কল্পনা করতেন। সেই একইভাবে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্বদেশকে জননীরূপে দেখতেন। তাঁর কাছে দেশ মোটেই জড়পদার্থ ছিল না, তিনি ছিলেন জীবন্ত, আমাদের দেশজননী। তাঁকে আমরা ভক্তি করি, আমরা নিত্য পুজো করি। সেই মায়ের বুকের ওপর বসে রাক্ষস যদি রক্তপান করে তাহলে তখন সন্তানরা সেই মাকে উদ্ধার করতে প্রাণদান করবে। এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করতে শুধু ক্ষত্রতেজ নয়, আমাদের ব্রহ্মতেজকে প্রয়োগ করতে হবে বলে শ্রীঅরবিন্দ মত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই দেশভক্তি ছিল মজ্জাগত। বিলেতে থাকাকালীন তাঁর এই দেশপ্রীতি জেগেছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ভারতকে স্বাধীন করা তাঁর ঈশ্বরপ্রদত্ত একটি মহান ব্রত। তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল, ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে শাসনব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল

থেকে মুক্ত করে দেশবাসীকে স্বাধীন করা। বিশেষত, ১৯০৩ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি দেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগস্থাপন করেছিলেন তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল, দেশের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে দেশবাসীর প্রাণে ও মনে স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগানো। তিনি মনে করতেন যে, সরকারের কাছে নিছক আবেদন-নিবেদন নীতির বলে দেশ কখনই স্বাধীন হবে না। দেশকে স্বাধীন করতে হলে বৈদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে। তাই, এই কাজের জন্য বেশ কয়েক বছরের প্রস্তুতির প্রয়োজন। তা না হলে দেশকে কোনমতে স্বাধীন করা যাবে না বলে তাঁর মনে হত। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা দেশবাসীর অন্তত ৫০ বছরের সংগ্রামের ফল। দেশের একটা অংশের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতার ফলে কতিপয় ব্রিটিশ শাসক তৎকালীন দেশের অন্তত ৩০ কোটি মানুষকে পরাধীনতার জালে আবদ্ধ করে দেশ শাসন করতে সমর্থ হয়েছিল। এজন্য তাঁর পরামর্শ ছিল, দেশের যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের নিয়ে গুপ্ত সমিতি গঠন করতে হবে। সেই সমিতির সদস্যরা নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা, লাঠিখেলা, কুস্তি করার পাশাপাশি সমাজসেবা, বিপ্লবীদের জীবন নিয়ে আলোচনা ও পত্রিকা প্রকাশ করবে। তাঁরা সরকারের সঙ্গে সব বিষয়ে অসহযোগিতা করে বৈদেশিক শাসনের ভিত্তিকে দুর্বল করবে। প্রয়োজনে দেশের সর্বত্র গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করে সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সশস্ত্র অভিযান শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সর্বশেষে বলপূর্বক ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবে।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রায় ৯ বছর পরে শ্রীঅরবিন্দ ১৯০২ সালে দেশের স্বাধীনতা লাভের একান্ত ইচ্ছায় বাংলায় প্রথম গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। এর পূর্বে পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ঠাকুর রামসিংহের নেতৃত্বে কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গঠন করা হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ সেগুলির সঙ্গে একদা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, একসময় তিনি সেগুলি পরিচালনাও করতেন। এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী ও ব্যারিস্টার পি. মিত্র কলকাতায় এই ধরনের ব্যায়াম অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে গুপ্ত সমিতির কাজ চালাতেন। একসময় সরলা দেবী 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। সেই পত্রিকায় একদা তিনি 'বিলাতি ঘুষি বনাম দেশি কিল' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই লেখায় তৎকালীন যুবসমাজ অতিশয় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রে বীরাষ্টমীর অনুকরণে একসময় কলকাতায় তিনি দুর্গাষ্টমীর দিনে অস্ত্রপূজার আয়োজন করতেন। স্বদেশি আমলে বাংলায় সগৌরবে জাতীয়তাবাদের প্রচার মহাধূমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। তবে এই ধরনের জাতীয়বাদের প্রথম প্রচার শুরু হয়েছিল মহারাষ্ট্রে। একদা সেই মহারাষ্ট্রে তিলক শিবাজি উৎসবের আয়োজন করতেন। তাঁর অনুকরণে বাংলাতেও সরলা দেবী ও তাঁর সহযোগীরা একসময় শিবাজি উৎসবের আয়োজন করতেন। গুপ্ত সমিতি গঠনের পূর্বে ১৮৯৭ সালে ব্যারিস্টার পি. মিত্রের উদ্যোগে কলকাতায় অনুশীলন সমিতি গঠন করা হয়েছিল। ১৯০২ সালে শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় গুপ্তসমিতি গঠনের জন্য যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকে বরোদা থেকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। সেইসময় ভগিনী নিবেদিতা বরোদায় গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কালক্রমে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

পরবর্তীকালে বাংলায় গুপ্ত সমিতি গঠন করা নিয়ে যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকুমারকে নিবেদিতা অনেক সহযোগিতা করেছিলেন। ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত বাংলায় এই গুপ্ত সমিতি গঠন করা নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হলেও পরে এর সঙ্গে যুক্ত যুবকেরা হতাশ হয়ে পড়েন। তখন বাধ্য হয়ে শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার পুনরায় বরোদায় ফিরে যান। এবারে সেখানে গিয়ে তিনি অধ্যাপনা ও যোগসাধনায় পরিপূর্ণ মগ্ন হয়ে যান।

১৯০৪ সালে বাংলায় গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রয়াস ভেস্তে গেলেও ১৯০৫ সালে বাংলাই হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল। মারাঠী নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলেছিলেন, "What Bengal thinks today,India will think tomorrow". অর্থাৎ আজ বাংলা যা চিন্তা করে, ভারত আগামীকাল তাই চিন্তা করবে। তাই, দেশের বড়লাট লর্ড কার্জন বাঙালির সেই শক্তিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্য বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পূর্ব বাংলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটি প্রদেশ ও পশ্চিমবাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে আর একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেই মুহূর্তে বাঙালি জাতি সেই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। ইতিমধ্যে সরকার ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব চূড়ান্ত করে। এরপর ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় বিলেতি দ্রব্য বর্জন করার প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়। অবশেষে সরকার ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্যকর করে। আর সরকারের সেই প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আসামকে নিয়ে একটি প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে আর একটি প্রদেশ গঠিত হয়। এদিকে বাঙালি ১৬ই অক্টোবর দিনটিকে জাতীয় শোকদিবস রূপে পালন করে। এর ফলে সেদিন বাংলার ঘরে ঘরে অরন্ধন দিবস পালন করা হয়। শুধু তাই নয়, সেদিন সকালে বাঙালিরা নদী বা জলাশয়ে স্নান সেরে একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে দেয়। বাঙালিরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগাতে সেদিন এই সৌভ্রাতৃত্বের অনন্য কর্মসূচি পালন করেছিল। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সেই আঘাত বাঙালি জাতির কাছে শপে বর হয়েছিল। বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে কথা বলে গুপ্ত সমিতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তীব্রতর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায় প্রমুখ যুক্ত হন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় তাঁর চাকুরি ত্যাগ করে কলকাতায় কর্মক্ষেত্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে বরোদা ত্যাগের স্বল্পকাল পূর্বে ১৯০৫ সালের শেষের দিকে শ্রীঅরবিন্দ 'No compromise' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। তাতে তিনি বলেন যে, বাঙালি কোনমতেই বঙ্গভঙ্গ মেনে না নিয়ে এর বিরুদ্ধে আপসহীন প্রতিবাদ জানাবে। সেটি তিনি বেনামে লিখেছিলেন। কলকাতার গুপ্ত প্রেস থেকে এটি ১৯০৬ সালে বারীন্দ্রকুমার ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তখনকার 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই পুস্তিকার একটি কপি দেওয়া হয়। এর পূর্বে শ্রী অরবিন্দ 'ভবানী মন্দির' গ্রন্থে বলেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেতে হলে শক্তির সাধনা

প্রয়োজন। শিবাজি নিজেও এই ভবানীর সাধক ছিলেন। 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানদলের ন্যায় 'ভবানী মন্দির'-এও সর্বত্যাগী যুবকদের কথা বলা হয়েছে। ১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশালে প্রাদেশিক কনফারেন্সে যোগ দিতে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে বাংলায় এসেছিলেন। বাঙালি তখন দেশপ্রেমে মেতেছিল। আর সেই দেশপ্রেমের মন্ত্রই ছিল 'বন্দে মাতরম্'। তখন পূর্ব বাংলার বরিশালে স্বদেশি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল গড়ে উঠেছিল। আর তার নেতৃত্বে ছিলেন জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত। সেদিনের সেই কনফারেন্সে সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লবীরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, ব্রিটিশ পুলিশ সেই কনফারেন্স বানচাল করতে ব্যাপক পীড়ন শুরু করেছিল। শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্র যিনি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি তো সভামণ্ডপ ত্যাগ করবেন না বলে জানিয়ে দেন। এই কনফারেন্সের পর শ্রীঅরবিন্দ পুনরায় বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি আবার বরোদায় ফিরে যান। ১৯০৬ সালের ১২ই জুন থেকে ১৯০৭ সালের ১১ই জুন পর্যন্ত তিনি বিনা বেতনে এক বছরের ছুটি নিয়ে পুনরায় কলকাতায় আসেন। পরবর্তী ৪ বছর তিনি একটানা স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করায় ইতিমধ্যে বাংলার বহুসংখ্যক ছাত্র স্কুল কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সুরাহা করতে ১৯০৫ সালের ৯ই নভেম্বর কলকাতায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয়তাবাদী নেতা জমিদার ও রাজা সুবোধ মল্লিক মশাই। সেই সভায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাজা সুবোধ মল্লিক মশাই এজন্য ১ লক্ষ টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। এরই মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রাজা সুবোধ মল্লিকের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তারপর তিনি শ্রীঅরবিন্দকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদে যোগ দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। অবশেষে ১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ কলকাতায় এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার দানশীল জমিদার ও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তখন অর্থ সাহায্য করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় ৭৫০ টাকা বেতনের সহাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদ ১৫০ টাকার বিনিময়ে গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হারান চাকলাদার প্রমুখ বিদ্বজ্জন এই শিক্ষা পরিষদে যুক্ত হন। কলকাতার বাইরে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তখন এই জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদে এক বছরকাল কর্মরত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের মূল লক্ষ্য ছিল, দেশের যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে গুপ্ত সমিতি গঠন করা ও তারপর একটি মুখপত্র প্রকাশ করে মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে জোরদার করা। শ্রীঅরবিন্দের আদেশে বারীন্দ্রকুমার বরোদা থেকে ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় এসে দ্বিতীয়বার গুপ্ত সমিতি গঠন ও 'যুগান্তর' নামে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এতে স্বাধীনতার মর্মবাণী মানুষের কাছে তুলে ধরা হত। ইতিমধ্য ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে আবার কলকাতায় আসেন। এর অল্পকাল পরে জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল 'বন্দে মাতরম্' নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিপিনচন্দ্র তাঁর এই পত্রিকা পরিচালনায় তখন শ্রীঅরবিন্দের সহযোগিতা কামনা

করেন এবং তাতে তিনি সম্মতও হন। বিপিনচন্দ্র বিদেশে ধর্মপ্রচার করা অপেক্ষা দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা বড় কাজ বলে মনে করতেন। এই ভাবাদর্শ প্রচারে তিনি 'নিউ ইন্ডিয়া' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন। স্বদেশি যুগ শুরু হলে কলকাতা থেকে বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে 'যুগান্তর' ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'সন্ধ্যা' নামক ২টি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ হত। আর বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাটি ইংরাজিতে প্রকাশ করা হত। সকলেই স্বাধীনতাকে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বলে স্থির করেছিলেন। এরপর রাজা সুবোধ মল্লিক ও নীরদ মল্লিকের অর্থসাহায্যে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে এটি প্রকাশিত হতে শুরু করে। তবে কয়েক মাস পরে এই পত্রিকার লক্ষ্য নিয়ে মতভেদ তৈরি হওয়ায় বিপিনচন্দ্র সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন। এরপর পত্রিকার পরিচালকরা শ্রীঅরবিন্দকে এর সম্পাদকের পদে নিয়োগ করেন। বাংলার যুবকদের সংঘবদ্ধ করে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে জোরদার করার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। সেই সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাটি দলের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ করা হচ্ছিল। এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়ার ফলে ১৯০৭ সালের ২রা জুন থেকে এটি একটি সাপ্তাহিক সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ফলে সারা দেশে এটি একটি প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকার মর্যাদা লাভ করেছিল। সেইসময় দেশে কংগ্রেসের কর্মধারা নিয়ে দুটি পক্ষ তৈরি হয়েছিল। এক পক্ষ নরম বা মডারেট, আর অন্য পক্ষ হল গরম বা জাতীয়তাবাদী। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ, বোম্বাইয়ের ফিরোজ শা মেহতা, পুনার গোখলে প্রমুখ ছিলেন মডারেট। আর পুনার তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, বাংলার বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ ছিলেন জাতীয়তাবাদী। সমকালীন পর্বে জাতীয়তাবাদের উদ্যোগে কংগ্রেসে স্বরাজ, স্বদেশি, বয়কট আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। তাঁদের মতে, স্বরাজ পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ব্যক্ত করে। স্বদেশি হল, কোনভাবে বৈদেশিক শাসকের মুখাপেক্ষী না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। বয়কটের অর্থ হল, বিরোধী শক্তিকে বর্জন করা। ভারতীয় শিক্ষার মর্মার্থ হল, দেশমাতৃকার কাজে সকলকে সমর্পিত হয়ে আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ করা। কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত এই মূল নীতিগুলি দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরই মধ্যে স্বেচ্ছাচারী ব্রিটিশ সরকারের কাছে 'বন্দে মাতরম্', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী পত্রিকার জনপ্রিয়তা তখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার আদালতে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনেছিল। এরপর সরকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে ভেদ-নীতি গ্রহণ করেছিল। জাতীয় আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখতে ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা হয়। এর পরেই ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহের জামালপুরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। সেইসময় রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, তিনি তো 'স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তি'। দেশব্যাপী সেইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে শ্রীঅরবিন্দ রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে যখন বিচারের অপেক্ষায় জামিনে মুক্ত ছিলেন ঠিক তখন তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দেন। তারপর ছাত্রেরা ২১শে আগস্ট অধ্যক্ষকে

বিদায় সংবর্ধনা জানিয়ে তাঁর ত্যাগ, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। তার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য—শিক্ষার্থীদের শুধু জ্ঞানদান ও জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত করে তোলা নয়, তারা মাতৃভূমির মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাজ করবে, দেশসেবা করবে এবং এজন্য তাদের দুঃখবরণ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দও ১৮৯৭ সালে আমেরিকা থেকে মাদ্রাজে এসে সমবেত যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আগামী ৫০ বছর সেই পরমা জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হন। এদিকে, কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মি. কিংস ফোর্ডের এজলাসে বিচার বসেছিল। তাতে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পালকে রাজদ্রোহের অভিযোগে ৬ মাসের কারাদণ্ড ও শ্রীঅরবিন্দকে মুক্তি দিয়ে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তখন দেশবাসী শ্রীঅরবিন্দের ত্যাগ ও প্রতিভার পরিচয় জানতে পেরেছিল। এর ফলে তাঁর সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। এতকাল তিনি পরোক্ষে থাকলেও এবারে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্যে জাতীয় নেতা হিসেবে তাঁর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন।

নীতি ও আদর্শের কারণে বিভক্ত কংগ্রেসের মডারেট ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কালক্রমে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ চরমে ওঠে। এর ফলে তারা একসঙ্গে সাংগঠনিক কোন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারত না। ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালের ডিসম্বের মাসের প্রথমে মেদিনীপুরে দলের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স ও তারপর সুরাট কংগ্রেসে এই বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক বছরের জন্য কংগ্রেসের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পায়। এক সঙ্গে কোন কাজ তখন করতে না পারায় তারা পৃথকভাবে সংগঠনের কাজ করতে শুরু করেছিল। এদিকে, কংগ্রেসের সেই দুর্গতিতে সরকার মহাখুশি! কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী শক্তির বিনাশ এবং স্বাধীনতা আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় সরকার তখন নিশ্চিন্ত হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ সেইসময় কোনমতেই জাতীয়তাবিরোধী মডারেটদের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে সম্মত ছিলেন না। বৈদেশিক শাসনের পরিবর্তে তিনি তখনও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে অনড় ছিলেন। একটা সময়ে মডারেটপন্থী তিলক জাতীয়তাবাদী শ্রীঅরবিন্দের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তাঁর মত গ্রহণ করেছিলেন। এদিকে সুরাট বিপর্যয়ের পর কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্তৃত্ব কিন্তু তখন মডারেটদের ওপরে ন্যস্ত ছিল। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে মডারেটদের উদ্যোগে কংগ্রেসের লাহোর সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তবে সেখানে জাতীয়তাবাদীরা কেউ যোগ দেননি। তার ফলে সম্মেলনে তেমন লোকজন হয়নি। শ্রীঅরবিন্দ তখন আলিপুর ও তিলক মান্দালয়ে কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯১৬ সালে তিলক ও অ্যানি বেশান্তের চেষ্টায় জাতীয়তাবাদীরা অবশেষে কংগ্রেসে যোগ দেন। ততদিনে অবশ্য মডারেটদের প্রতি মানুষের আস্থা চলে যায় এবং ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে মডারেট ও জাতীয়তাবাদীরা একত্রিত হয়ে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে সকলে সহমত ব্যক্ত করেন। ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও লাহোর সম্মেলনে কংগ্রেস শ্রীঅরবিন্দের সেই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ রূপদান করার লক্ষ্যে অবিচল ছিল। শ্রীঅরবিন্দ বরাবর রাজনৈতিক কর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনা

একই সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। প্রাণায়াম করার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সাধনা শুরু করতেন। তবে তিনি একদা ভেবেছিলেন যে, সাধন পথে অগ্রসর হতে হলে একজন সাধকপুরুষ প্রয়োজন হয। বারীন্দ্রকুমার সেই ধরনের একজন সাধক যোগীকে জানতেন। তিনি হলেন গোয়ালিয়রের এক মারাঠা ব্রাহ্মণ বিষ্ণু ভাস্কর লেলে। তিনি একজন গৃহী যোগী। সেইসময় সুরাট থেকে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় ছিলেন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে লেলে মহারাজের সঙ্গে বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতি সেদিন শহরবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এরপর এক নির্জন নিবাসে তিনি লেলে মহারাজের সঙ্গে ধ্যানে মগ্ন হন। তিনি তখন ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে যান। ঈশ্বরকে তিনি পরিপূর্ণ রূপে সবটাই সমর্পণ করেছিলেন। আর সেখানে ধ্যানের ফলে তিনি যেন নিশ্চল নীরব ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করেছিলেন। শুধু এক অব্যক্ত ব্রহ্মাই আছেন, আর সমগ্র জগৎটাই যেন তাঁর ছায়ামাত্র। আবার কী করে মনটাকে শূন্য করতে হয় তা তিনি লেলে মহারাজের কাছ থেকে শিখেছিলেন। তাঁর এই যোগ-সাধনার মূল লক্ষ্য ছিল, বিপুল কর্মশক্তি লাভ করে কর্মযজ্ঞে মগ্ন হয়ে যাওয়া। রবীন্দ্রনাথের একটি কথা এই প্রসঙ্গে এখানে বড়ই সঙ্গতিপূর্ণ। তা হল—"শূন্য করে রাখ তোমার বাঁশি/বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি।" রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভাবনা যেন মিলে যায়। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সাধনার মূল নীতি ছিল, ঈশ্বরে সব কিছু সমর্পণ করা। বরোদায় তিনি দু'মাসের যোগসাধনার পর ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় চলে আসেন। এবারে তিনি মানবগুরু নন, অন্তর্যামীর আদেশে নিজস্ব সাধনপথে অগ্রসর হন। বরোদা থেকে কলকাতায় ফেরার পথে তিনি প্রথমে বোম্বাই, তারপর কলকাতার শান্তির মাঠ, বারুইপুর, পাবনা, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে দেশের সংকটে দেশবাসীর কর্তব্যের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। জাতীয়তাবাদীদের মতে, স্বরাজ কথাটির প্রকৃত অর্থ হল পূর্ণ স্বাধীনতা। ব্রিটিশ শাসক ইতিমধ্যে এদেশের ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। সেগুলি হল—ছাত্র নির্যাতন, জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকা বন্ধ করা, বিনা বিচারে সরকার বিরোধী নেতৃবৃন্দকে নির্বাসন দেওয়া এবং হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা। এছাড়া, শাসন সংস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে মডারেটদের হাতে রেখে জাতীয়তাবাদীদের উচ্ছেদ করা তাদের লক্ষ্য ছিল। একটা সময়ে সরকার গৃহীত নির্যাতন নীতি দেশবাসীর মনে গভীর নিরাশা সৃষ্টি করেছিল। এদেশের মানুষ তখন উপলব্ধি করেছিল যে, ব্রিটিশ শাসকরা এদেশ থেকে কোনদিন যাবে না। আর সেই নৈরাশ্য ও হতাশার কারণে বাংলায় আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা ও বিপ্লববাদের উপস্থিতি ঘটেছিল। আর এই সকল বিপ্লববাদী কর্মসূচিতে তখন বাংলার সমগ্র যুবসমাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৯০৭ সালের ২৪ শে জুলাই 'যুগান্তর' মামলায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাস হয়েছিল। তারপর ২৮শে আগস্ট 'যুগান্তর' পত্রিকা সম্পাদনার ভার অন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেইসময় কলকাতার মানিকতলার ৩২ নম্বর মুরারিপুকুর রোডে বারীন্দ্রকুমারের পৈতৃক বাগানবাড়িতে বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবীদল গঠন করা হয়। দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করাই হল তাঁদের মূল লক্ষ্য। তারা গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে অস্ত্র ও বোমা তৈরির কৌশল আয়ত্ত করেছিল।

এর কয়েকদিনের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তিনি জানান যে, ১৯০৭ সালের শুরু থেকে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মোট ১৪/১৫ জন যুবককে উদ্বুদ্ধ করে তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যুবকরা হলেন উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ। ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ফলে তাঁরা মৃত্যুকেও ভয় পেত না। সেই বিপ্লবীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাংলার তৎকালীন ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করার জন্য মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে বোমা নিক্ষেপ করলে তিনি রক্ষা পেয়ে যান। এরপর ১৯০৮ সালের ১২ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলে তিনিও রক্ষা পেয়ে যান। তারপর ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বিহারের মজঃফরপুরে বিপ্লবীদের বোমার আঘাতে দুই নিরপরাধ মহিলার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য ছিল মজঃফরপুরের জেলা জজ কিংসফোর্ড। আর বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় নেতৃত্ব দেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি। এই ঘটনায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল। আর প্রফুল্ল চাকি পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে আত্মঘাতী হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, স্বদেশি যুগে প্রথম শহিদ হন এঁরা দু'জন। এই ঘটনার পর ২রা মে পুলিশ ভোররাতে মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে হানা দিয়ে বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র রায়কে গ্রেপ্তার করে। তাছাড়া, সেখান থেকে পুলিশ বেশ কিছু বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র ও আপত্তিকর কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল।

শ্রীঅরবিন্দ সেইসময় বাংলার জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা 'নবশক্তি' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। সেইজন স্কট লেনের বাড়ি ছেড়ে তিনি গ্রে স্ট্রিটের বাড়িতে বাস করছিলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ও ভগিনী সরোজিনী দেবী ছিলেন। ১৯০৮ সালের ২রা মে ভোরবেলায় তাঁর গ্রে স্ট্রিটের বাড়িতে প্রবেশ করে পুলিশ অতর্কিতে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেফতার করে। তখন তিনি বিছানায় নিদ্রিত ছিলেন। পুলিশ তাঁর কোমরে দড়ি বাঁধে ও হাতে কড়ি পরিয়ে দেয়। তাঁর এই গ্রেফতারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা সেখানে চলে যান। মডারেট নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাঁর গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানান। শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্র সেখানে এসে এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। পরে পুলিশ তাঁর হাতকড়ি খুলে দিয়েছিল। পুলিশ তাঁর ঘরখানি প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে তল্লাসি চালায়। বহু চিঠিপত্র ও অন্যান্য নথি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। গ্রেফতার করার পর তাঁকে প্রথমে স্থানীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে লালবাজারের হাজতে তাঁকে রাত্রিবাস করতে হয়। বিহারের মজঃফরপুরে ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বিপ্লবীদের ছোড়া বোমার আঘাতে নিহত দুই মহিলার হত্যার অভিযোগে পুলিশ শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেফতার করেছিল। তারপর তাঁকে রয়েড স্ট্রিটের গোয়েন্দা দফতরে নিয়ে গিয়ে মুরারিপুকুরে বারীন্দ্রের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তাঁর কোন যোগসূত্র আছে কিনা তা পুলিশ জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু সেইসব ঘটনা তাঁর অজ্ঞাতেই ঘটেছিল বলে তিনি পুলিশকে জানান। এরপর তাঁকে লালবাজার থেকে বিচারের জন্য আলিপুর আদালতে পাঠানো হয়। অবশেষে, আদালত থেকে তাঁকে আলিপুর জেলখানায় প্রেরণ করা হয়। সেখানে ১৯০৮ সালের ৫ই মে থেকে ১৯০৯ সালের ৫ই মে পর্যন্ত তিনি একটানা কারাবাস করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সেই কারাবাসের জীবনকে আশ্রমবাস বলে অভিহিত

করেছিলেন। সেই কারাকক্ষে তিনি একান্তে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থখানি নিত্য অধ্যয়ন করতেন। একদা বরোদায় লেলে মহারাজের সঙ্গে যোগধ্যানের সময় তাঁর ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়েছিল। আর আলিপুরের কারাবাসে তাঁর 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' এই উপলব্ধি লাভ হয়েছিল। তাছাড়া, এই কারাকক্ষে তিনি দুটি মহাবাক্যও লাভ করেন। যথা—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ও 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। আলিপুর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বোমার মামলার প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয় ১৯০৮ সালের ১৯শে মে। এই মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করা ও বোমা এবং বে-আইনী অস্ত্র রাখার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল। ১২ই সেপ্টেম্বর প্রাথমিক তদন্ত শেষ হয়। তারপর শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ ৩৬ জনকে আলিপুরের দায়রা আদালতে পাঠানো হয়। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, তিনি বারীন্দ্রকুমার সহ অন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। বারীন্দ্রকুমার ছিলেন বিপ্লবীদলের নেতা। তাঁকে শ্রীঅরবিন্দ বুদ্ধি ও প্রেরণা দিতেন বলে অভিযোগ। এই মামলার রাজসাক্ষী হলেন নরেন গোঁসাই। দায়রা আদালতে বিচার শুরুর আগে ১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কারাগারের মধ্যে সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্ত বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে গুলি করে হত্যা করেন। বিচারে সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্তকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। আলিপুরের বোমার মামলা চলেছিল ১৯০৮ সালের ১৯শে অক্টোবর থেকে ১৯০৯ সালের ৫ই মে পর্যন্ত। সহকারি দায়রা জজ বিচক্রফ্‌ট সাহেব ছিলেন এই মামলার বিচারক। এই জজ সাহেব কেম্ব্রিজে শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। আই.সি.এস পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ গ্রীক ভাষায় প্রথম ও বিচক্রফ্‌ট সাহেব দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। দায়রা আদালতে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে সওয়াল করেন তাঁর প্রিয় বন্ধু ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সরকারি কৌশলী নর্টন সাহেবের উত্থাপিত বিষয়গুলি চিত্তরঞ্জন এমন আইনগ্রাহ্য যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছিলেন যাতে জজ সাহেব শ্রীঅরবিন্দকে বেকসুর খালাস করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর জজ সাহেব বলেন যে, ইনি অত্যন্ত ধার্মিক ও দেশভক্ত মানুষ। জজ সাহেব সেই মামলায় ৩৬ জন আসামীর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ সহ ১৭ জনকে নিঃশর্তে মুক্তি দেন আর অবশিষ্ট ১৯ জনকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির কথা ঘোষণা করেন। শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে দেশবাসী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হন। আর সেই মামলায় তাঁর কৌশলী ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে দেশবাসী অভিনন্দিত করেন। দীর্ঘ এক বছর কারাবাসের পর ১৯০৯ সালের ৬ই মে জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় প্রায় ১০ মাস কাল অতিবাহিত করেন। তখন বিপ্লবীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের জন্য দেশের সর্বত্র পরিস্থিতি যেন স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেইসময় তিলক ছিলেন মান্দালয় জেলে ও বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন বিলেতে। কারামুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ পুনরায় জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি 'কর্মযোগিন্' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক ও 'ধর্ম' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। বলাবাহুল্য, 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাটি ১৯০৬ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বের হয়েছিল। 'কর্মযোগিন্'-এর প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৯০৯ সালের ১৯শে জুন ও 'ধর্ম' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হয়েছিল ১৯০৯ সালের ২৩শে জুন। তবে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা ত্যাগের

পরেই এই পত্রিকা দু'টি বন্ধ হয়ে যায়। কারামুক্তির পর তিনি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ রূপে দেশবাসীর সামনে উপস্থিত হন। তাঁর 'কারা কাহিনী' গ্রন্থে এর মর্মকথা উল্লিখিত আছে। কারামুক্তির পর ২৩শে জুন ঝালকাঠিতে তিনি বরিশাল সম্মিলনীতে যোগ দেন। তারপর সেপ্টেম্বরে হুগলির চুঁচুড়ায় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে অংশ নেন। এরপর একে একে কলকাতার বিডন স্ট্রিট, কুমারটুলি, কলেজ স্কোয়ার এবং হাওড়ায় আয়োজিত জাতীয়তাবাদী সভায় তিনি দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য দেশবাসীকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁর লেখা 'খোলা চিঠি' তখন দেশবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল।

১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক রাতে পুলিশি হেনস্তার আগাম সতর্ক বার্তা পেয়ে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতার 'কর্মযোগিন্' পত্রিকার কার্যালয় থেকে বেরিয়ে সোজা গঙ্গার ঘাটে চলে যান। তাঁর সঙ্গে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও বীরেন ঘোষ নামে দুই যুবক সেখানে গিয়েছিলেন। একমাত্র অন্তরের নির্দেশে তিনি ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর ও পণ্ডিচেরি যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তিনজন একটি ভাড়াটে নৌকায় চেপে কলকাতা থেকে ভোরবেলায় চন্দননগরে পৌঁছান। তারপর শ্রীঅরবিন্দ সেখানকার এক পূর্ব পরিচিত চারুচন্দ্র রায়ের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে একটি লোককে পাঠালে তিনি তাঁকে আশ্রয় দিতে ভয় পান বলে জানান। কেননা, তিনি আলিপুর বোমার মামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেই সকালে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ নামে তাঁর এক সহযোগী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে চারুচন্দ্র রায় তখন তাঁকে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে আসার খবরটি দেন। তখন শ্রীশচন্দ্র তাঁর এক নিকটতম প্রতিবেশী মতিলাল রায়কে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে আসার খবরটি জানান। এই মতিলাল রায় স্থানীয় যুবসমাজের নেতা ছিলেন। তাছাড়া, শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা স্পষ্ট। তাই, কালবিলম্ব না করে তিনি দৌড়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে গোপনে তাঁর বাড়িতে সাদরে নিয়ে এসে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এর পূর্বে চন্দননগরের গঙ্গার ঘাট থেকে তাঁর সঙ্গী দুই যুবক পুনরায় কলকাতায় ফিরে যান। মতিলাল রায়ের বাড়িতে পৌঁছে তিনি নির্জন নিত্য যোগধ্যানে মগ্ন থাকতেন। পুলিশ তখনও কিন্তু তাঁর পিছু ছাড়েনি, তাঁর গতিবিধির ওপর তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এসবের মধ্যে মাত্র দেড় মাসকাল সেখানে অবস্থান করে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরি যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেখানে যাওয়ার জন্য তাঁর মাসতুতো ভাই সুকুমার মিত্র, চন্দননগরের মতিলাল রায়, উত্তরপাড়ার বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও লেখক নগেন্দ্রনাথ গুহরায় অতি গোপনে তাঁর পণ্ডিচেরি যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৯১০ সালের ৩০ শে মার্চ রাতে শ্রীঅরবিন্দ নৌকাযোগে চন্দননগর ত্যাগ করেন। ১লা এপ্রিল ভোরে কলকাতার চাঁদপাল ঘাট থেকে ডুপ্লেক্স নামে একটি ফরাসি জাহাজে করে পণ্ডিচেরির উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হন। আর পণ্ডিচেরিতে তিনি পৌঁছান ৪ঠা এপ্রিল। ছদ্মনামে তিনি ও তাঁর এক সঙ্গী সেই জাহাজে উঠেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের ছদ্মনাম ছিল যতীন্দ্রনাথ মিত্র আর তাঁর সঙ্গী আলিপুর বোমার মামলায় মুক্তিপ্রাপ্ত যুবক বিজয়কুমার নাগের ছদ্মনাম ছিল বঙ্কিমচন্দ্র বসাক। শ্রীঅরবিন্দ যেন ম্যালেরিয়া রোগে ভুগে এখন তাঁর নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছেন। জাহাজের টিকিট কেনার সময় এইসব অজুহাতের কথা তাঁকে বলতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়,

পুলিশের চোখ এড়াতে তাঁকে নিয়ে কয়েকজন যুবক চন্দনগর থেকে উত্তরপাড়া হয়ে একটি নৌকায় চেপে ইতিমধ্যে কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে পৌঁছেছিল। এর মধ্যে তাঁর মাসতুতো ভাই সুকুমার মিত্র জাহাজের দু'টি সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কেনেন। সেই সঙ্গে জাহাজের একটি কেবিনও তিনি রিজার্ভ করেন। সেই টিকিট দু'টো ছাড়াও দু'টো বাক্স ও বিছানাপত্র নগেন্দ্রনাথ গুহরায়কে দিয়ে তিনি চাঁদপাল ঘাটে পাঠান। সবশেষে, ডাক্তারি পরীক্ষার পর শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গী ছাড়পত্র পান এবং তারপর জাহাজের রিজার্ভ কেবিনে তাঁরা রাত ১১টার পূর্বে পৌঁছে যান। উত্তরপাড়ার জমিদারের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের জন্য টাকা পাঠিয়েছিলেন এবং অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও কিছু টাকা তাঁর হাতে তুলে দেন। পরিশেষে, যাঁরা তাঁকে পৌঁছে দিতে চাঁদপাল ঘাটে এসেছিলেন এবারে তাঁরা সকলে বিষাদঘন চিত্তে জাহাজ থেকে ধীরে ধীরে নেমে তাঁদের বাড়ি ফিরে যান।

শ্রীঅরবিন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষের এই পুণ্য লগ্নে তাঁর দেশজননীর পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন তা আজ ও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। দেশের স্বাধীনতার লাভের ৭৫-তম বর্ষে এই দেশপ্রেমিক যোগসাধক ঋষি শ্রীঅরবিন্দ যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা যুগ যুগ ধরে দেশবাসীকে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করবে।

গ্রন্থসূত্র ঃ

(১) শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন ঃ প্রমদারঞ্জন ঘোষ, ওরিয়েন্ট বুক কোং, কলকাতা, ১ম সং জুন, ১৯৯৬

(২) শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির, কলকাতা, প্রকাশ ১৫ই আগস্ট, ১৯৭২

(৩) শ্রীঅরবিন্দ স্মারক গ্রন্থ, বর্ধমান জেলা শ্রীঅরবিন্দ জন্ম শতবার্ষিকী সমিতি, আগস্ট ১৯৭৩

স্বাধীনতা-চিন্তার ধারায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজ্যোতির্ময় গোস্বামী

ভূতপূর্ব সহযোগী অধ্যাপক, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান

কোনো সাংগঠনিক শক্তি সঙ্গে না নিয়ে ব্যক্তিগত দায়িত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে সব থেকে উঁচু আওয়াজের প্রতিবাদটা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই এ দেশ শুনতে পেয়েছে মাঝে মাঝেই। বস্তুত, দেশীয় স্বরাজ-সাধনার সূচনা অনেকটা তাঁরই পরিবার ও পিতৃদেবের প্রচেষ্টায় ঘটেছিল, আমরা অনেকেই তা জানি। অনেকে এও জানি যে, নাইটহুড ত্যাগ করবার আগে তিনি সশরীরে জালিয়ানওয়ালাবাগ গিয়েও প্রতিবাদে শামিল হতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জন দাশই বরং সেদিন রাজী হন নি কিছু করতে। যে মানুষটি ব্যক্তিগত প্রতিবাদে পরাক্রান্ত, তিনি কিন্তু তথাকথিত স্বাধীনতা আন্দোলনে সে অর্থে ঠিক হাজির হলেনই না কখনো। স্বদেশী আন্দোলন ঠিক স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর যোগদান না করার কারণ কী, তারই দিকে নজর দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে আজ খুব। শুধু অতীতের অলস জাবর কাটার জন্যে নয়, ভবিষ্যতের সভ্যতা সৃজন করবার জন্যেও। এইজন্যে বলছি, সহিংস ও অহিংস, চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুই ধারার বাইরেও আন্দোলনের আরও একটি সম্ভাবনাময় ধারা ছিল, এইটা আমাদের খেয়াল থাকে না অথচ আজ সময়ান্তরে এসে তার গুরুত্ব বোঝা সহজ হয়ে এসেছে বলেই মনে হয়। অন্যান্য অসংখ্য হিসেব ছেড়ে দিলেও, আজ স্বাধীনতার প্লাটিনাম জয়ন্তীতে পৌঁছে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানতে পারি, এমনকি পাকিস্তানের অর্ধেকের বেশি মানুষ ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকায় আজও বেদনাহত। এঁদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ যাঁরা প্রধানত তরুণ বয়স্ক, তাঁরা আর শুধু পাকিস্তানের পঁচাত্তর বছরের ইতিহাস নিয়ে গর্ব করতে চান না, গৌরব বোধ করতে চান সাত হাজার বছরের অখণ্ড ভারতীয় ইতিহাসকে নিয়েই। তখন মনে হয়, এই তাড়াহুড়ো-করা খণ্ডিত স্বাধীনতার দাম সত্যিই কি ছিল খুব বেশি? বিশেষত, প্রতি একজন ব্রিটিশ যখন, আমরা ছিলাম তিনহাজার জন ভারতীয়? লড়াইয়ের কি সত্যিই কোনো তৃতীয় বিকল্প ছিল না? এই তৃতীয় ধারাটি সম্পর্কে ধারণা দুর্বল হওয়ার কারণে মানুষের সামর্থ্য চর্চার ক্ষেত্রেও একটা চরম ঔদাসীন্য দেখা দেয়, যার ফলে মানুষ শোচনীয়ভাবে হীনবল হয়ে পড়ে। অকারণে প্রবলও হতে হয় কখনো আমাদেরই মধ্যে অন্য অন্য 'তোমরা' সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠতে পারতাম কিনা। তার থেকেও বড় কথা, আমরা বিশ্বে শান্তি ও সুস্থায়িত্বে-ভরা এক অন্যতর সভ্যতার দিশারী হয়ে উঠতে পারতাম কিনা। একথা আরও মনে হয় যখন দেখি, যাদের ঘৃণা ভরে তাড়িয়ে দিয়েছি সদর দরজা দিয়ে, তাদেরই সংস্কৃতি, আদব-কায়দাকে খিড়কি পথে ফিরিয়ে এনেছি

পরম মমতায়। আবার, দেশ ভাগ হয়ে গেলে সাম্প্রদয়িকতার যে সমস্যা নির্মূল হয়ে যাবার কথা ছিল, তাও যখন পশ্চিম থেকে শেখা রাজনীতির সুবাদে তবুও টিকে থাকে। এবং সমাজের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশের অতি-সক্রিয়তার দ্বারাই পরিচালিত হয় আজকের দলীয় রাজনীতি, যখন বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য তথা পুরো সমাজটার জন্যই নির্দিষ্ট হয় অতি-নিষ্ক্রিয়তা। যাদের কাছে কবির সেই প্রার্থনা 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' সুদূর স্বপ্ন হয়েই থাকে।

এখনকার সব থেকে বড় প্রশ্ন হলো, যেভাবেই স্বাধীনতা এসে যাক, এই এসে যাওয়ার পরেও ওই তৃতীয় পন্থার কোনো ভূমিকা আজ ফলপ্রসূ হতে পারে কিনা, তার আন্দাজ নেওয়া আবশ্যক।

আত্মশক্তি ও সমূহ

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নহীনভাবে মানুষের স্বাধীনতার স্বপক্ষে। আজীবন মানুষের সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করেছেন, তারই জন্যে সমর্পণ করেছেন নিজের সমগ্র জীবনকে। ধন-জন-মান প্রভৃতি সব কিছুকে নিয়ে আসক্তির সঙ্গে সঙ্গে 'আপন শোকের আসক্তিতে'-ও তিনি দেখেছেন বন্ধনের বিচিত্র ক্রিয়াশীলতা। অতিশয়ী আত্মপরতা ঘিরেছে যাকে, আকাশও তার কাছে এক মূর্তিমান কারাগার হয়ে দেখা দিতে পারে, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তাই তিনি আর্ত নিঃশ্বাস ফেলেছেন, "আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারই আবরণ"। দেখেছেন, "আত্মীয়ের অধীনতাতেও পরাধীনতার গ্লানি আছে"। অব্যর্থ আর্ষ-উক্তি করেছেন,

'মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা
একটা বাঁধন কাটে যদি বেড়ে ওঠে চারখানা।'

এই গানে ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মতো তিনিই বলে দিতে পারেন :
'পর তো আছে লাখে লাখে কে তাড়াবে নিঃশেষে
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে পর করে দেয় বিশ্বে সে।'

তিনি কি ঋষির মতোই জানতে পেরেছিলেন, কুইট ইন্ডিয়ার পরে পরেই সারি সারি অপেক্ষা করে আছে কুইট পাকিস্তান, কুইট খালিস্তান প্রভৃতি অখণ্ড ভারতীয় সমাজের অংশে অংশে আরও অসংখ্য আত্মবিচ্ছেদের অবশ্যম্ভাবিতা?

তার অফুরন্ত উদাহরণ তাঁর জীবনের অসংখ্য লেখার মধ্যে আছে ছড়িয়ে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) সাত আট বছরের মধ্যেই, তিনি লক্ষ করেছিলেন ইংরেজের তরফ থেকে মুসলিম সমাজকে কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। ১৮৮৭ সালে কংগ্রেসের মুসলিম নেতা বদরুদ্দীন তায়েবজি সভাপতি নির্বাচিত হলে আলিগড় আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমেদ খান তার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, হিন্দুর সঙ্গে মিলে কংগ্রেসের বিরোধিতা করলে লাভ হবে না, বরং ক্ষতি হবে। তাঁর ইংরেজ সংসর্গ থেকে তিনি বুঝে ফেলেছিলেন যে, সংখ্যালঘু মুসলিম স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ইংরেজ-হিন্দু

বিরোধে বিশেষ সুবিধা আদায় করার জন্যে ব্রিটিশের ওপরে চাপ সৃষ্টি করবে। 'ইংরাজের আতঙ্ক' নামক প্রবন্ধে সেই ১৮৯৩ সালেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন:

'এতদিনে ইংরাজ এ কথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিকস তেমন মারাত্মক নহে। আবহমান কালে ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পলিটিকাল ঐক্যের কোনো লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিকসও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে; মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কংগ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।'

এক কথায়, রবীন্দ্রনাথের কাছে পক্ষ-প্রতিপক্ষের লড়াইটাই ছিল যাকে বলে, একেবারে বহুতলিক। কাজেকাজেই অনেক বেশি সামগ্রিক। পরত্বের বিচিত্র ধাপ তিনি বিলক্ষণ দেখতে পেয়ে যান চোখের সামনে। ধর্ম-বর্ণ ভাষা-ভূগোল এমন কি, শ্রেণীগত আমরা-তোমরার মধ্যেও সমন্বয়ের সুষমা-সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথাই তিনি ভেবেছিলেন। জাতিগত সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে (ইংরেজ ও ভারতীয়) বা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িতাকে শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে (৪৬ - এর তেভাগা আন্দোলন) ঠেকাবার পুনর্জাগরণপন্থী বা বামপন্থী ব্যর্থ চেষ্টাও তাঁর সমন্বয়ী ভাবনায় মান্যতা পেতে পারতো না। দেশের মধ্যে ও দেশের মনের মধ্যে থাকা বিচিত্ররূপী পরত্বকে নির্মূল করার সামগ্রিক অর্থনৈতিক,নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা ও সংগ্রাম তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছিল সর্বাধিক। কোনো এক রকমের পরত্বের বিরুদ্ধে একজেদী অভিযান তাঁর গভীর মন ও মননের মান্যতা পায় নি। তাই ইংরেজ শাসকের তরফে প্রকটিত আগ্রাসিতার মোকাবিলা করাকে তিনি ভারতের পক্ষে প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করেন নি কখনোই। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, 'ইংরেজ গবর্মেন্ট আমাদের পরাধীনতা নয়, তাহা আমাদের গভীরতর পরাধীনতার প্রমাণ মাত্র।' (পথ ও পাথেয়, ১৯০৮)। তাঁর মনে হয়েছে, 'আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তুলছে না; এইজন্যে তাদের পরস্পর মিলনের কোনো গভীর উপলক্ষ নেই,' ছোট ছোট সৃষ্টিমূলক কাজের মাধ্যমে দেশকে নিজের করে পাওয়ার মধ্যে দিয়েই সামগ্রিক যে সম্পর্ক ও সংবেদনা সৃষ্টি হবে, তাই হলো তাঁর কাছে প্রকৃত 'স্বরাজসাধন'। এই সাধন-প্রক্রিয়ার দ্বারা দেশকে আপনার করে তোলা ও দেশের মানুষকে নিয়ে একটা 'মহাজাতি' গড়ে না তোলা পর্যন্ত, তাঁর মতে, 'ইংরেজ রাজত্বের যে প্রয়োজন তাহা কখনোই সম্পূর্ণ হবে না।' বড়ো কাজের ভান ও ছোট কাজে আলস্য আমাদের বোধশক্তির সীমাবদ্ধতাকেই প্রকটিত করে। তিনি এই সত্যটা সকৌতুকে ব্যক্ত করেছেন এইভাবে:

'আমরা সর্বদাই বলে থাকি, বিদেশী আমাদের রাজা, এই দুঃখ ঘুচলেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী রাজা আমি পছন্দ করি নে। পেট-জোড়া পিলেও আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেখেছি পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে আপনি এসে পেট জুড়ে বসেছে। বহুযত্নে অন্তরের প্রকোষ্ঠে তাকে পালন করলেও বিপদ, আবার রাগের মাথায় ঘুষি মেরে তাকে ফাটিয়ে দিলেও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে।' (সমস্যা, ১৯২৩)।

পরবর্তী প্রায় পাঁচ দশক ধরে তিনি এই সমস্যাটার কথাই জাতিকে বিশেষভাবে স্মরণ

করিয়ে এসেছেন। দেশ যখন ভাগ হয়ে গেল, সবাই তখন আকস্মিকভাবে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন খুব। অথচ রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে থেকেই নিশ্চিত করে জানতেন, এইটাই হতে চলেছে। আমেরিকা ও ফ্রান্সের স্বাধীনতা আন্দোলনের আদলে আমাদের স্বরাজ বা স্বাধীনতা আন্দোলন অনেকটা প্রভাবিত এইটা দেখেছিলেন তিনি। দেখে, উভয়ের মিল ও অমিলের দিকটা আলোচনা করে দেশবাসীকে অনেক আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন 'সমস্যা' (১৯০৮) নামক প্রবন্ধে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন বিপ্লবের আগে আমেরিকা ও ফ্রান্সের সামনে যে একমাত্র সমস্যা ছিল, যে সমস্যাটির মীমাংসার ওপরেই তাদের—

'মুক্তি নির্ভর করিত, আমাদের সম্মুখে সেই সমস্যাটি নাই। অর্থাৎ আমরা যদি দরখাস্তের জোরে বা গায়ের জোরে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে রাজি করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের সমস্যার কোনো মীমাংসাই হয় না; তাহা হইলে হয় ইংরাজ আবার ফিরিয়া আসিবে, নয় এমন কেহ আসিবে যাহার মুখের গ্রাস এবং পেটের পরিধি ইংরেজের চেয়ে হয়তো ছোটো না হইতে পারে।'

সাত বছর পরে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের অপরিহার্য পরিণামরূপে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রাদুর্ভাব দেখিয়েছেন। তার দু'বছর পরে সেই একই আশঙ্কাকে সামনে এনে তার প্রতিকারের দিকটি সম্বন্ধে বরাবরের মতো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন দেশবাসীর। 'ছোটো ও বড়ো' (১৯১৭) প্রবন্ধে বলেছেন,

'এমন যদি হয় যে, একদিন ভারত-ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-পরিবর্তনকালে প্রস্থানের বেলায় ইংরেজ তার সুশাসনের ভগ্নাবশেষের উপর রাখিয়া গেল আত্মনির্ভরে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম, আত্মকাল্যাণসাধনে অসিদ্ধ, আত্মশক্তিতে নষ্টবিশ্বাস বহুকোটি নরনারীকে রাখিয়া গেল এমন ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিবেশী নব উদ্যমে জাগ্রত, নব শিক্ষায় অপরিমিত শক্তিশালী, তবে আমাদের সেই চিরদৈন্যপীড়িত অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জন্য কাহাকে আমরা দায়ী করিব।'

অসহযোগের যুগে তাঁর বিখ্যাত 'সত্যের আহ্বান' (১৯২১) প্রবন্ধে তিনি 'ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব নামক ব্যাপারটিকে' রঙ-বদলানো গিরগিটি বা বহুরূপীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। একেবারে অব্যর্থ ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো করে বলেছেন:

'আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলস বদলাতে বদলাতে আমাদের হয়রান করে তুলবে।'

এই অবস্থায় তাঁর দাওয়াই ছিল, হিংসা অহিংসা কোনো পথেই না। বিশেষত অহিংসাতেও তাঁর কোনো গদগদ আকর্ষণ ছিল না। ছিল তার থেকেও বড়ো কিছুতে। অহিংসা অসহযোগের মধ্যে বেশিটাই নঞর্থক। অহিংসা কোনো মহৎ লক্ষ্য নয়। একটা কম ঝুঁকিপূর্ণ উপায়মাত্র। একটা লাগসই অস্ত্র। অন্তত বাস্তবে তাই ঘটেছে। মহৎ উপায়ের এই অস্ত্রায়ন যত মহৎ-মন্ত্রপূতই হোক, আত্মমুগ্ধতাবশত দৃষ্টি-ক্ষীণতাকে ডেকে আনতে পারে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অহিংসা

আন্দোলনের উপান্তে, স্বাধীনতার প্রাঙমুহূর্তে পৃথিবীর অন্যতম হিংস্র বীভৎসাও দেখা দেওয়াটা তার এক অকাট্য দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যপথের সেই বড়ো কিছুটা হলো, তাঁরই গানের ভাষায় বলতে পারি : 'মহাশান্তি মহাক্ষেম, মহাপুণ্য মহাপ্রেম'। এ কি বায়বীয় কোনো কবিতা? সব লড়াই থেকে পালিয়ে যাওয়া? লড়াই বলে কি সেখানে তাহলে কিছুই ছিল না তাঁর প্রকল্প-প্রকরণে?

বিলক্ষণ ছিল। বরং লড়াইটাই সেখানে প্রশস্ততর আকারে ছিল। মুক্ত ছিল বরং কোনো শস্তা শর্টকাটের সহজিয়া মোহজাল থেকে। 'দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয় নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে।' এইখানে আমরা পৌঁছে যাবো তাঁর আত্মশক্তি-তত্ত্বের কাছে, যেখানে আসবে তাঁর তাবৎ শিক্ষাসংস্কারের কথা, পল্লীসঞ্জীবনের কথা, সমবায়ের কথা, সহযোগিতা- ও সম্প্রীতি-আশ্রিত লোকায়ত- তথা বিশ্বসমাজ-ভাবনার কথা।

জীবনের শেষ দুই/তিন দশকে রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্বায়িত মানুষ হয়তো পৃথিবীতে দু'তিনজন ছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই 'বিশ্বায়িত' মানুষদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতো বিশেষভাবে লোকায়ত মানুষ পৃথিবীতে সেদিন আর কেউ ছিলেন না। জীবনের শেষ পঞ্চাশটা বছর তিনি মূলত গ্রামেই ছিলেন। গ্রাম এবং গ্রাম-বিশ্বের একটি সুস্থায়ী বিশ্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে তাঁর ছিল নিত্য ঔৎসুক্য। নিত্য তৎপরতা। ভাবতে অবাক লাগে, ভারতের জন্যে এমন দুই প্রান্ত-জোড়া সামগ্রিক একটি ভাবনা ভোকাল ফর বোথ লোকাল অ্যান্ড গ্লোবাল, কী করে জাতির সামনে এমন জোরের সঙ্গে তিনি তুলে ধরতে পেরেছিলেন এতদিন আগে। আজ যা পৃথিবী জুড়ে একটা আন্দোলনের বিষয় হয়ে উঠেছে? বিশেষত তাঁর মতো একজন সম্ভ্রান্ত-সুকুমার, আধুনিকেরও অগ্রগামী, নগরজাত এক শ্রেষ্ঠ রুচির মানুষ হয়েও? গ্রাম্যতা যাঁর কাছ থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে বাস করে, তাঁর মুখে গ্রামপ্রীতির তথা পল্লীপুনর্গঠনের এতো বিচিত্র কথা এবং শুধু কথা নয়, জীবনের সব থেকে ফলবান দীর্ঘ পঞ্চাশটা বছর শত অসুবিধে সত্ত্বেও সেখানেই প্রধানত চাষ এবং বাস করেছিলেন যিনি? বোধ করি তাঁর মতো গ্রাম-শক্তির বিশ্বরূপ এ বিশ্বে এমন করে আর কেউ দেখাতে পারেন নি। সেই জন্যেই আমরা বলে থাকি, তিনি হয়তো আরও তিন/চারবার নোবেল পুরস্কার পাবার মতো বই লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁকে যদি মাত্র একবারের জন্যেই ও পুরস্কারটি দেওয়া ঠিক হয়ে থাকে শেষ পর্যন্ত, তাহলে তা তাঁর কোনো বই-ই আর সে দাবি করতে পারবে না। তাঁর সব বই, সব সৃষ্টি যে মহাসৃষ্টির ব্লুপ্রিন্ট 'শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন কম্বাইন্ড'-ই সেই এক ও অদ্বিতীয় নোবেলটি পাওয়ার দাবি করতে পারে। তাই তো তাঁর জন্মদিনকেই আমরা 'বিশ্ব গ্রামোত্থান দিবস' ঘোষণার দাবি করে থাকি। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-উন্নয়ন ভাবনার দ্বারা প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ হলেও তিনি সে কাজকে কখনোই প্রাথমিকতা দিতে পারেন নি। স্বাধীনতার পরে তাঁর অনুসারীরাও পশ্চিমী উন্নয়ন ভাবনার দ্বারাই চালিত হয়েছেন। ফলে ইংরেজ আমলে গ্রামত্যাগের যে সূচনামাত্র হয়েছিল, ইংরেজ চলে যাবার পরে তা একটা হিড়িকে পরিণত হয়। একা উত্তরাখণ্ডেই তিন হাজার সাতশো গ্রাম আজ কেবল ভূতের আবাসস্থল হয়েছে। তার বাইরের গ্রামগুলি থেকেও তরুণ প্রজন্মের বড়ো অংশটাই শহরমুখী লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে রবীন্দ্রনাথের এই গ্রামাশ্রয়ী সমাজমুখী ভাবনার কি কোনো পূর্বসূরী ছিলেন, কোনো সমযোগী ?

রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরিতা ও সমযোগিতা

চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা (১৮৬৭) যে স্বাদেশিকতার জন্ম দিয়েছিল, তার মূল বাণীটাই ছিল আত্মশক্তির জাগরণ। এবং তারই প্রয়োজনে এসেছে কুসংস্কার বর্জিত ধর্মীয় পুনর্জাগরণ, বিদেশী পণ্য বয়কটের ভাবনা,স্বদেশী শিল্প ও অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন।

ইংরেজ এদেশে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই চলেছিল একধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। প্রায় একশো বছর জুড়ে চলেছিল অনেকটাই অবিমিশ্র গ্রহণ। কিঞ্চিৎ বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে দেখি উনিশ শতকের সেই মধ্যভাগে গিয়ে। তামাম আঠারো ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে বাংলার মূল সুরটাই ছিল গ্রহণের। ইতস্তত প্রতিবাদ ছিল না তা নয়। প্রাথমিকভাবে সেটা ছিল মূলত ধর্ম নিয়ে।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলার উনিশ শতকী মনীষা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, ইংরেজকে সঙ্গে নিয়েও লড়াই করেছে। কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন, মধ্যযুগীয় জড়তা থেকে জাতির জেগে ওঠার সেটাই ছিল সঠিক পথ। প্রথমে দেখা দিয়েছিল ধর্মকলহ। সংস্কারপন্থী ও সংরক্ষণপন্থী উভয়েই শতাব্দীর মধ্য ভাগ অতিক্রম করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে গভীর একটা ভারতীয় স্বর ফুটে ওঠে। তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যে 'বৃদ্ধ দাম্ভিকের' মুখে ইংরেজেরা (কৃষ্ণনগরের অধ্যক্ষ লব সাহেব তেমনটাই জানিয়েছেন।) নিজেদের কোনো প্রশংসাই নাকি শুনতে পায় নি। তাঁরই নেপথ্য নেতৃত্বে 'চৈত্রমেলা' বা 'হিন্দুমেলা' জাতির আত্মশক্তিতে জেগে ওঠার মূল সুরটা ধরিয়ে দেয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সমর্থিত ভারতসভা (১৮৭৬)-র আয়োজকদের দ্বারা ব্রিটিশ প্রভাবিত উদারনৈতিক রাজনীতির সূচনার মধ্যে দিয়ে ভারতের মাটি থেকে নিজস্বধারার সমাজ-রাজনীতির প্রতিষ্ঠা পরাভূত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত তার কণ্ঠস্বর হয়ে পড়ে ক্ষীণ। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব সঙ্কুচিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই স্বাদেশিকতা-দীপ্ত, প্রজ্ঞাগর্ভ, আত্মমর্যাদাবোধপূর্ণ, গঠনমূলক কার্যক্রম নতুনদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়। কংগ্রেস একদিকে নরমপন্থী অন্ধ ব্রিটিশ-ভজনা অথবা তার বিপরীতে গিয়ে প্রতীচ্য বিশ্ব থেকে পাওয়া চরমপন্থায় আমেরিকা-ফ্রান্সের বিপ্লবের অনুকরণেই ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গঠনপন্থী স্বদেশী ধারায়। এই ধারাটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে উত্তেজনার হুজুগে কার্যত ভেসে যায়। এবং সরকারের ধরপাকড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে যায়। যদিও রবীন্দ্রনাথ একক উদ্যোগে সেই কর্মধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্রতে অধিকতর নিবিষ্ট হন। ছেলে, জামাই ও বন্ধুপুত্রকে কৃষি গোপালন প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রসর বিদ্যার আহরণে আমেরিকা পাঠান। আরও কিছুদিন পরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত গঠনমূলক কাজকে শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবির বহুমুখী প্রতিভার চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ জাতি শিক্ষাব্যবস্থার

সঙ্গে বিরাট সম্ভাবনাময়,অভিনব ও অভূতপূর্ব অনুষঙ্গটির গভীর গুরুত্ব অনুধাবনে অক্ষম হয়। অপরদিকে, পাশ্চাত্য অনুসরণে জাতির সব উন্নয়নের ভার সমাজের হাত থেকে হৃত হয়ে পার্টি ও প্রশাসনের ক্ষুদ্র অংশে বন্দি হয়ে পড়ে। অথচ রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কার্যক্রমের কেন্দ্রেই ছিল এই সমাজ। আর প্রাচীন দেশীয় ব্যবস্থায় শিক্ষা ও সমাজের মাঝে কোনো বেড়া না থাকায় উভয়ের যোগে মানুষ প্রয়োজনীয় সম্পদ লাভ করেছে, কারিগরী বিদ্যায় অনগ্রসর থাকা সত্ত্বেও। কীসের জোরে ? সমাজ-আধ্যাত্মিক সাধনা বা প্রযুক্তির জোরে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় চলতো সংলগ্ন দুশোটিরও বেশি গ্রামের রাজস্ব থেকে। ফলে অব্যবহিত সমাজের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ায় ছিল তার নিত্য সজীব একটা জৈব যোগ। সেই ব্যবস্থারই যুগোপযোগী আয়োজনে দেশকে পাওয়ার ও গড়ে তোলার উপায় হিসেবেই শুরু করেছিলেন তাঁর শিক্ষাসংস্কার ও পল্লীসঞ্জীবনের ব্রত। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর অন্যান্য অভিনব কৌশলের সঙ্গে ইংরেজ বিতাড়নকেই প্রাথমিকতা দিয়ে এই উপমহাদেশের অবিরাম আত্ম-কলহের হতাশ দ্রষ্টা হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে সতর্ক করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, তিনি ঠেকে শিখতে রাজি আছেন। ঠেকে তিনি কী শিখেছিলেন, আমাদের জানা নেই। হয়তো ঘটনাবলীর আকস্মিকতায় আশ্চর্যই হয়ে থাকবেন। কিন্তু আমরা, এই উপমহাদেশের মানুষেরা, আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। অনেকেই আমরা জানি না, ভারতবর্ষের এই মহাপ্রহরীর (গান্ধীজীই তাঁকে অখ্যাত করেছিলেন, great sentinel of India বলে) সতর্কবাণী অনুধাবন করতে না পারায় আমাদের ক্ষতির পরিমাণ কত।

উনিশ শতকে এই ভারতীয় উপমহাদেশে অন্তত চার জন মহাপুরুষকে আমরা বিশ্বের নিরিখেই সহস্রাব্দের সেরা মানুষ বলে মনে করতে পারি। তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী ও শ্রীঅরবিন্দ। এই চারজনের সকলের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু জায়গায় অমিল থাকলেও যথেষ্ট মিল ছিল বহুদূর পর্যন্ত। অন্তত স্বাধীনতা আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে। চরমপন্থী শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্যপন্থী রাজনীতির পথ পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিক উন্মোচনের পথ ঘুরে দেশের সার্বিক জাগরণের উপায় অনুসন্ধান করেছেন। বিবেকানন্দও সেদিনের চালু তিন ধারার রাজনীতির মধ্যে গঠনমূলক কার্যক্রমেরই কাছাকাছি থেকেছেন। ধর্মের সঙ্গে শিক্ষাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তার সঙ্গেই সমাজ সেবাকে জুড়ে সর্বাত্মক জাতি গঠনে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন, স্বাধীনতা যেন-তেনভাবে এনে ফেলতে পারলেও তাকে রক্ষা করা সহজ নয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা

ড. হরগোবিন্দ দোলই

সভাপতি, বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল রুরাল লাইব্রেরী, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর

''স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়''—এই বোধ ও বোধির সঙ্গমে পৌঁছতে ভারতীয় উপমহাদেশের আপামর জনগণকে অনেক সংগ্রাম, অনেক ঘটনা আবর্তের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। প্রথমতঃ রাজতন্ত্রের খণ্ড, খণ্ড ভূমি শাসন, গ্রাম সমাজের স্বায়ত্ত্বশাসন মূলক প্রয়োজনভিত্তিক অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভর ব্যবস্থার ক্রম ক্ষীয়মান রূপ, অটোক্র্যাসি ও বুরোক্র্যাসির সঙ্গে গ্রামীন সমাজ সংস্কৃতির জটিল বন্ধন, ধর্মীয় তত্ত্ব দর্শন, স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসনের সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতি, নানাভাষার বহুবিচিত্র সহাবস্থান—এই সমাজের উপর 'নেশন' বা জাতীয় সত্ত্বার অখণ্ড ধারণার বোধ সহজে অনুবন্ধহীন ভাবে প্রতিষ্ঠা করা বা গণতান্ত্রিক চেতনা বা দর্শনের উন্মেষ ঘটানো—যতোই তা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নামক আইডিয়ার জয়ধ্বনি করা হোক না—খুব সহজ কাজ ছিলনা। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার পরে বিষয়টি আরও জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যায়। ভারতে এ যাবদ যে নরগোষ্ঠী-ই বাণিজ্যের কারণে হোক, ক্ষমতা দখলের কারণেই হোক বা ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদের লোভেই হোক—এখানে এসেছে, তারা প্রাথমিক চণ্ডনীতি পরে পরে পরিত্যাগ করে এদেশেই বসবাস করতে শুরু করেছে, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে তারা ভারতীয় সন্ততি হয়ে গিয়েছে। অন্ততঃ সহাবস্থানে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয় জাতিগুলি বিশেষতঃ ইংরাজ জাতি নিজেদের সিভিলাইজেশনের গর্বে ভারতীয় জনগণকে ডার্টি নিগার বা আনকালচার্ড কালা আদমী-ই ভেবেছে আর তাদের সম্পদ লুঠ করে, 'ন্যাবব' হতে চেয়ে তাদেরকে শাসন করে সভ্য মানুষ করতে তারাই দায়িত্ব পেয়েছে—এমন অভিযানে তারা সারা ভারতকে শুধু নয় প্রায় গোটা পৃথিবীকে শাসন ও শোষণ করেছে।

''লাইসিন পারমিট ঘুষ তিন হাতিয়ারে।
কোম্পানি ঘায়েল কইল তামাম দুন্যারে।।''— *ফেরঙ্গমঙ্গল কাব্য, পৃঃ*-৬১

একদিকে ক্ষমাহীন সমাজ আর প্রীতিহীন ধর্মের অত্যাচারে সমস্ত ভারতীয় জনগণ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে বেঁচে থাকার মানে হারিয়ে ফেলছে অন্যদিকে ব্রিটিশ বেনিয়া কোম্পানির তীব্র শোষণে স্বাধীনতার বোধটাই তখন অবলুপ্ত। সেই আত্মসম্মিত হারা জাতিকে নিজ চৈতন্যে স্থিত করার জন্যে, জাতিকে স্বাধীনতার পাঠ শেখানো, সকলের তরে সকলে আমরা—এই গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান ভাণ্ডারের সাহায্য নিয়ে যে নবজাগরণ শুরু হয় তার একটা অন্বিষ্ট বিষয় জাতির স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটানো। ইংরাজ রাজশক্তি

এই জাতীয় ভাব বিকাশের পক্ষে ছিল না স্বাভাবিক ভাবেই, কারণ তারা প্রতিপক্ষ ছিল, তারা কোনো দিনই ভারতীয় হতে চায়নি বা ভারতীয় উপমহাদেশকে উপনিবেশ ছাড়া অন্য কিছু ভাবার কারণও তাদের ছিল না। কিছু কিছু মহৎ ইংরেজদের বা ইউরোপীয়ানদের কথা বাদ দিলে প্রায় সমগ্র ব্রিটিশ কালচারের কাছে ভারত ছিল বন্য বর্বরদের দেশ আর কাঁচামাল যোগানোর পশ্চাদ্‌ভূমি। জাগ্রত জাতি তাই ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের, আত্মবিকাশের স্বার্থে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেই গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামী অধ্যায়ে মেদিনীপুর ছিল স্বমহিমায় স্বতন্ত্র। বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী জনগণের কাছে যিনি গান্ধীবুড়ী—তাঁর গরিমায় শহীদ হওয়ার বিষয় ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে কতখানি অবদান রেখেছে সেটাই এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট বিষয়।

বস্তুতঃপক্ষে মীরকাসিমের বন্দোবস্তে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগণ যখন মেদিনীপুরের দেওয়ানি (সঙ্গে বর্ধমান ও ইসলামাবাদ) পায় তখন থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়ার ট্রান্সফারের সময় পর্যন্ত কোনোদিনই ইংরাজগণ এই জেলাকে পুরোপুরি শাসন করতে পারেনি। ব্রিটিশ বেনিয়া জাতির উদ্দেশ্য ও চাতুরি পথম দিন থেকেই বুঝে ফেলেছিলেন মেদিনীপুরবাসী। তাই এক দুঃসাহসিকা রাণী শিরোমণির নেতৃত্বে শুরু হয় চুয়াড় বিদ্রোহ, যথাক্রমে—পাইক বিদ্রোহ, নায়েক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, জমিদারি বিদ্রোহ, মলঙ্গী বিদ্রোহ। নীল বিদ্রোহ এবং জাতীয়তাবাধের উন্মেষের পর—যেটির পুরোধা পুরুষ ছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ এই যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য এলেন অরবিন্দ ঘোষ বারীন ঘোষ প্রমুখেরা, যুক্ত হলেন জ্ঞানেন্দ্র মোহন বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো—তাঁদের-ই অমর সৃষ্টি শহীদ ক্ষুদিরাম।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবোধের আগের বিদ্রোহগুলি কৃষক স্বার্থ, গোষ্ঠী স্বার্থ, জমিদার স্বার্থেই মূলতঃ সংঘটিত হয়েছিল। সিপাই বিদ্রোহের কালে একজন তেওয়ারি ব্রাহ্মণ সৈনিককে মেদিনীপুরে কেল্লার মাঠে বিদ্রোহে যোগ রাখার জন্য ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু ডিরোজিও তাঁর রচিত ইংরেজী কবিতা (সনেট) দি হার্প অফ ইণ্ডিয়া, টু ইণ্ডিয়া—মাই নেটিভ ল্যাণ্ড,—যা নৈর্ব্যক্তিক স্বদেশ প্রেমের উৎসমুখ বা কবি ঈশ্বর গুপ্তের— ''ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে....'' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে যার বিকাশ, রঙ্গলাল, মধুসূদনে যার সৃষ্টি সৌরভ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদে, চারণকবি মুকুন্দ দাসে যার ভাব বিপ্লব— সেই স্বাদেশিকতার জোয়ার আসে রাজনারায়ণ-এর হাত ধরে স্বভাব-বিপ্লবী মেদিনীপুর বাসীর চেতনায়। সেই চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অহিংস ও সহিংস দুই পথে। অহিংস পথের জাগ্রত বিবেক—

> ''বীর্য শুল্কা আদর্শ রমণী বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী
> ব্রিটিশ গুলিতে জীবন দানিয়া হয়েছে যশস্বিনী।'' —*বিপ্লবী মেদিনীপুর, সুরেন্দ্রমোহন দে*

উপরিউক্ত আলোচনায় বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিকগুলি দেখানো হলেও রামমোহন, বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণ, সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর ভারতসভার, নবগোপাল মিত্রের দিকগুলি দেখানো হলেও রামমোহন, বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণ, সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর ভারতসভার, নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রায়োগিক দিকগুলির কথা ও সভা সমিতির কথা— এ আলোচনায় বিশেষ স্মরণযোগ্য।

বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার হোগলা গ্রামের মাহিষ্য পরিবার নিম্ন মধ্যবিত্ত—এই পরিবারের কর্তা ঠাকুরদাস মাইতি, গৃহিনী ভগবতীদেবী, ছেলে নেই তিনটি মেয়ে, সবার ছোটো মাতঙ্গিনী। বাল্যকালে পুঁথিগত শিক্ষার সুযোগ পান নি। কিন্তু মনুষ্যত্বের শিক্ষা যে যথেষ্ট পেয়েছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর জীবনচারণ থেকে আমরা যথেষ্টই বুঝতে পারি। তাঁর জন্মকাল নিয়ে নানা মতদ্বৈধতা থাকলেও (কেউ বলেছেন ১৮৮০ খ্রীঃ কারও মতে ১৮৭০ খ্রীঃ) তাঁর স্নেহধন্য সহযোদ্ধা, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের তমলুক থানার দ্বিতীয় অধিনায়ক প্রিয়নাত জানা লিখেছেন, ''কলকাতা থেকে প্রায় ৪২ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে অবস্থিত মেছেদা স্টেশন। এই স্টেশনের নিকটবর্তী হোগলা নামক গ্রামের এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম হয় মাতঙ্গিনীর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে—ঠিক যে সালে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীরজন্ম।''—ভারতের জোয়ান-অব-আর্ক বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী, পৃঃ ১০। ঐ গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী বারো বছর বয়সে মাতঙ্গিনীর বিবাহ হয় হোগলা থেকে এক মাইল দূরে 'আলিনান' গ্রামের বিপত্নীক ষাট বছর বয়স্ক ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে। প্রথম পত্নী মল্লিকা হাজরার মৃত্যু হলে ত্রিলোচন দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। ছ'বছর পরে ত্রিলোচনের মৃত্যু হলে মাত্র আঠার বছর বয়সে মাতঙ্গিনী বিধবা হন এবং সতীন পুত্র (মহেন্দ্র হাজরা প্রমুখ) দের নিয়েই তিনি ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রাম শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে— ''আদর্শ হিন্দু বিধবা রমণীর পূর্ণ ব্রত তিনি আজীবন পালন করে চলছিলেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতেন তিনি। ...দিনে আতপ চালের ভাত এবং রাত্রে পরটা, চালভাজা বা মুড়ি প্রভৃতি খেতেন। বরাবর তিনি স্বপাক অর্থাৎ নিজ হাতে রান্না করে খেতেন। এমন কি আন্দোলন চলাকালে শিবির জীবন যাপনের সময়ও তাই করতেন।

ধর্মাসক্তি

মাতঙ্গিনী ছিলেন নিষ্ঠাবতী ধর্মপরায়ণা রমণী। সকালে স্নান করে তুলসী মঞ্চে জল দিয়ে ঠাকুরের নাম করার পর কিছু আহার করতেন। মাতঙ্গিনী ছিলেন গৌরবর্ণা, সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী। বিধবা হওয়ার পর খুব ছোট ছোট করে চুল ছাঁটতেন, টিকি রাখতেন এবং কপালে তিলক কাটতেন। ভক্তিমূলক গান, কীর্তন, ভজন ও যাত্রা বিশেষ করে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালাগান শুনতে ভীষণ ভালোবাসতেন মাতঙ্গিনী।''—পূর্বোক্ত গ্রন্থ

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশী ব্রত থেকে তিনি প্রথম দেশপ্রেমের প্রেরণা লাভ করেন (১৯০৫ খ্রীঃ) এবং বিলেতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মাতঙ্গিনী দলবেঁধে রামেন্দ্রসুন্দরের, 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পাঠ শুনতেন তন্ময়ভাবে আর প্রতিবেশীদের উদ্বুদ্ধ করতেন স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য। নিজে নিজ হাতে চরকায় প্রস্তুত সুতোয় তৈরী থান' ব্যবহার করতেন। গৃহকর্ম, কৃষিকর্ম, গৃহপালিত পশুদের পরিচর্যা, অতিথি সেবা, প্রতিবেশীদের রোগশোকে তাদের পাশে সর্বতোভাবে দাঁড়ানো তাঁর নিত্যদিনের ব্রত ছিল। যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন, দেশের কাজ করেন তাঁদের তিনি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ভাবতেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনের সময় থেকেই গান্ধীজীকে চোখে না দেখেও গান্ধীগত প্রাণা হয়েছিলেন। এমন-ই তাঁর বিশ্বাস যে তিনি তার উপাস্য শ্রীকৃষ্ণকে ও গান্ধীজীকে প্রায়

একাসনে বসিয়েছিলেন। ব্রিটিশের শত অত্যাচারেও মেদিনীপুরবাসী চরকা ত্যাগ করেনি আবার গান্ধীজী যখন চরকা আন্দোলন শুরু করলেন এটাই মাতঙ্গিনীর 'সাধনা' হয়ে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র ও চরকা তাঁর কাছে সমগুরুত্বে গৃহীত হয়েছিল। ''অন্য কর্ম একদিন বাদ পড়লে ক্ষতি ছিলনা। কিন্তু চরকা কাটা বাদ পড়ার উপায় ছিলনা।'' গান্ধীজীর প্রতি তাঁর বিশ্বাস যেন সাধন-লব্ধ তত্ত্বে পরিণত হয়েছিল। গান্ধী বিশ্বাসের পূর্বে তিনি বাত ব্যাধি থেকে উপশম পাওয়ার জন্য আফিম খাওয়া অভ্যাস করেছিলেন। গান্ধীর নামে শপথ করে তিনি আফিম ত্যাগ করেন এবং মনের জোরে বাতজ ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করেন। কঠিন অসুখে পড়েও তিনি কোনো ওষুধ গ্রহণ করেন নি। গান্ধীজীর নাম করে 'সিন্নিজল' খেয়ে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন, আর কখনও কোনো অসুখে তিনি ভোগেননি—শহীদ হওয়ার দিন পর্যন্ত। সর্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর থেকেই তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তমলুকের দুই অবিসংবাদিত নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় ও সতীশ সামন্ত তাঁর বয়ঃ কনিষ্ঠ হলেও তাঁদের মাতঙ্গিনী অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন ও তাঁদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চাইতেন। দুই নেতাও মাঝে মাঝে মাতঙ্গিনীর বাড়ি গিয়ে নিরামিষ ভাত, ডাল তরকারি, চালভাজা, পরটা ইত্যাদি পরম তৃপ্তিভরে খেয়ে আসতেন। যখনই মাতঙ্গিনী তমলুকে আসতেন তখনই নিজ হাতে উৎপন্ন ফসলের দুটি বড়ো পোঁটলা সঙ্গে আনতেন। একটি দিতেন তমলুক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে, অন্যটি অজয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। দুই স্থানেই যতী ব্রতী ও অনাথ আতুরদের সেবার ব্যবস্থা ছিল। গৃহে আগত কোনো মানুষ কিছু না খেয়ে তাঁর বাড়ি থেকে যেতে পারতো না। কখনও জোর করে কিছু আনাজ তাদের দিয়ে দিতেন। মাটির বাড়ি যে কতো সুন্দর থাকতে পারে তা মাতঙ্গিনীর বাড়িতে গেলেই সকল বুঝতে পারতেন। সমস্ত বাড়িটি যেন শান্তি ও পবিত্রতার প্রতীক। সপত্নী পুত্র মহেন্দ্র হাজরা মাতঙ্গিনী স্নেহনির্ঝরে স্নান করে স্বদেশ ব্রতে অংশ নিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী হিসাবে যোগদান করেন। নরনারায়ণ সেবা, দেশহিতব্রত, সর্বজীবে সমদর্শিতা— তৎকালীন সময়ে এই সমস্ত গুণের সাক্ষাৎ মূর্তি ছিলেন মাতঙ্গিনী— আর তরুণ দেশ কর্মীগণ তাঁর প্রদীপ্ত বদনমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে এক অপূর্ব প্রেরণা লাভ করতেন, আত্মশক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠতেন।— ''তখন বাহাত্তোর বছর বয়সের বৃদ্ধার বিস্ময়কর উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস দেখে আমি সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁকে দেখে এবং তাঁর আবেগদীপ্ত কথাবার্তা শুনে আমার দেশপ্রেমের প্রথম দীক্ষা হয়েছিল বলা যায়।'' পূর্বোক্ত গ্রন্থের লেখকের স্বীকারোক্তি। কোনো দল বা মতের দাসত্ব না করেও তিনি ছিলেন মহান স্বদেশব্রতী ও মানবতাবাদী।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী লবণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযানে নামলেন। মেদিনীপুর জেলায় এই আন্দোলন এক অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছিল। জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমা দুটি এমনিতেই পূর্বে লবণ উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল ছিল। সেই ধারাকে অনুসরণ করে প্রায় প্রতিটি পরিবার এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। জনগণের স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনকে দমন করতে ব্রিটিশ শাসক বদ্ধপরিকর হয়। শাসকের অমানুষিক অত্যাচার কল্পনারও অতীত। আর এই অত্যাচারে সক্রিয়ভাবে যারা অংশ নেয় তারা এদেশেরই পুলিশ গুপ্তচর বাহিনীর চাকরিজীবী ও ব্রিটিশ তাঁবেদার। ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রতি অপরিসীম আনুগত্যে তারা—

''বাপের ঠাকুর বলি ফেরঙ্গেরে গণে।
সাহেব হইতে সাধব বাবু পোষে মনে।।
দালালের মেলবাবুর গোলামের বংশ।
সর্বদাই শির ঝুঁকায় দাস অবতংস।।

ফেরঙ্গমঙ্গল কাব্য

সাহেব হওয়ার মোহ যেমন একশ্রেণির মানুষের ছিল তেমনি ব্রিটিশ প্রভুরা 'ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসি' সঠিকভাবে রূপায়িত করতে পেরেছিল ভারতের মাটিতে। আর এক শ্রেণির রাজকর্মচারী, 'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ' হয়ে সাহেব ভজনার অতি পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। তাই ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্ত ঝরার ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। নারীর অসম্মান, সম্পদ লুঠ, গৃহে অগ্নিদান, শিশু পীড়ন এমনকি গৃহ দেবতার অসম্মান কিছুই বাদ দেয়নি এই সমস্ত নরপশুরা। মাতঙ্গিনী পরিপূর্ণভাবে এই আন্দোলনে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। সাময়িকভাবে সংসার জীবন ত্যাগ করে সম্পূর্ণ শিবির জীবন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ভিতরে ভিতরে তো আছি-ই, বাইরে আর নাই বা গেলাম—এমন মনোভাব কখনোই তিনি গ্রহণ করেন নি। মাতঙ্গিনী ও সতীনপুত্র মহেন্দ্র হাজরা বাড়ির অদূরে অবস্থিত 'চৌদ্দ-বিঘা মড়াছি'র কে (শ্মশান) লবণ সত্যাগ্রহের শিবিরে পরিণত করেন। এই উচ্চ ভূমিটি বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মাঝখানে অবস্থিত ছিল, যাওয়ার কোন রাস্তা ছিল না। এক কোমর জল ভেঙে ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হতো। শিবির দেখাশোনা, অংশগ্রহণকারীদের খাওয়া দাওয়া, পুলিশী অত্যাচার থেকে সত্যাগ্রহীদের যথাসম্ভব রক্ষা সমস্ত করতেন মাতঙ্গিনী স্বয়ং। মড়ার খুলি, হাড়গোড় টাঙিয়ে স্থানটিকে গুপ্ত রাখার অভিনব চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। তবুও গুপ্তচরদের সহায়তায় পুলিশ নিরস্ত্র, অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর মর্মান্তিক অত্যাচার করত। নরপশুদের লাঠির আঘাতে সত্যাগ্রহীদের মাথা ফাটতো, হাত, পা ভেঙে যেত। তাঁদের মনোবল অটুট রাখতে একদিকে তিনি যেমন প্রবল প্রেরণা যোগাতেন, তেমনি অকুতোভয়ে পুলিশ বাহিনীর সম্মুখীন হতেন। গ্রাম্য ভাষায় অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে তাদের ধিক্কার দিতেন, ''আমাদের এই দেশের মাটিতে যে লবণ আছে, তা প্রকৃতি প্রদত্ত। সোনার বাড়া এই মাটি থেকে লবণ তৈরী করা আমাদের জন্মগত অধিকার। তোমরা তো এদেশেরই মানুষ। বাড়ীতে তোমাদেরও তো মা-বোন আছে। আমাদের উপর যখন অত্যাচার কর, তখন তাদের কথা মনে পড়ে না তোমাদের? একই দেশবাসী হয়েও আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাও কোন সাহসে? লজ্জা করেনা আমাদের গায়ে হাত তুলতে? লবণ আমরা তৈরী করবই—দরকার হলে এজন্য প্রাণ দোব। তোরা নিপাত যা, তোরা জাহান্নামে যা।'' এর পুরস্কার তিনি সঙ্গে সঙ্গে পেতেন। মারধোর, পাশবিক অত্যাচার কিছুই বাদ যেত না। কখনও গাড়ীতে করে তুলে নিয়ে গিয়ে বহুদূরে ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি। তিনিও ছিলেন জেদী। দশ বারো মাইল হাঁটা তার কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না। চৌকীদারি ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনে, আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি আরও সক্রিয় ভূমিকা নেন। এই আন্দোলনে মেদিনীপুর বাসীর গৌরবময় ভূমিকার কথা সুভাষচন্দ্র উচ্ছ্বসিত ভাবে স্বীকার করেছেন। ''The success of the No-Tax

campaign gained considerable strength and self confidence to the people of Midnapur and popularity to their leader Mr. B. N. Sasmal.''

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তমলুক মহকুমা আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে পুলিশী অত্যাচারের সম্মুখীন হন মাতঙ্গিনী এবং ইউনিয়ন জ্যাককে অসম্মান করার অপরাদে ছ-মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বহরমপুর জেলে অন্তরীণ থাকেন। ঐ সালেই ২৬ জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালনের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠ করেন।

মেদিনীপুরে গণ আন্দোলন, মুক্তির আন্দোলন যতো তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে পুলিশী অত্যাচারও ততো মাত্রা ছাড়া তীব্রতা পেয়েছে। বিপ্লববাদী আন্দোলনকারীগণ এই সমস্ত অত্যাচারীদের সমুচিত প্রত্যক্ষ শিক্ষা দিতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিন, তিন জন জেলা শাসককে (জেমস প্যাডী, রবার্ট ডগলাস ও জে. ই. বার্জ) বিপ্লবীগণ হত্যা করেন—যা স্বাধীনতা আন্দোলনে নজিরবিহীন ঘটনা। ইংরাজ শাসনযন্ত্রও নানাভাবে মেদিনীপুরকে শক্তিহীন করার জন্যে ষড়যন্ত্র রচনা করে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর বিভাজনের ষড়যন্ত্র আটকে ছিলেন ব্যারিষ্টার ক্ষীরোদ বিহারী দত্ত, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিভাজন আটকালেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দিশেহারা ব্রিটিশ শাসক মেদিনীপুরবাসীদের শায়েস্তা করার বিষয়ে আলোচনার জন্য তৎকালীন বাংলার গভর্ণর স্যার জন হার্বাটকে তমলুকে পাঠায়, দমনমূলক পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এমন পুলিশী ব্যবস্থা নেওয়া হলো যে কংগ্রেসের হার্বাটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রায় বানচাল হওয়ার যোগাড়। নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়ে মাতঙ্গিনী চারজন নারীসঙ্গিনী সহ সুকৌশলে সভাস্থলে প্রবেশ করে হার্বাটকে কালো পতাকা দেখালেন এবং গো-ব্যাক ধ্বনি দিতে লাগলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল মাতঙ্গিনী ও তাঁর সঙ্গিনীদের উপর। পতাকা কেড়ে নেওয়ার ধস্তাধ্বস্তি, সম্মিলিত প্রহার। স্বয়ং হার্বাট পুলিশ বাহিনীকে ধমক দিয়ে ধিক্কার জানালেন তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে পাঁচ জন বর্ষীয়সী মেয়েকে সসম্মানে মুক্তিদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নেত্রী মাতঙ্গিনীর প্রশংসাও করলেন। পুলিশ কর্তারা অধোবদন। তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের সামনে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে হার্বাটকে আবার কালো পাতাকা দেখিয়ে গো-ব্যাক ধ্বনি দেন, আবারও হার্বাট সাহেবের হস্তক্ষেপে সসম্মানে মুক্তি পান। যখন তিনি গো-ব্যাক ধ্বনি দেন তখন শব্দগুলির মানেও তিনি জানতেন না। ভেবেছিলেন ওটার মানে সকলেই তোমরা গরু। কিন্তু নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় যখন মানে বুঝিয়ে দিলেন যে ওটার মানে হার্বাট ফিরে যান, তখন মাতঙ্গিনী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—ওই একই হলো দাদা ! মুগ্ধ অজয়কুমার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে। এইভাবে কংগ্রেসের বহু দুঃসাধ্য কর্মসূচী তিনি জীবন বিপন্ন করেও সম্পন্ন করেছেন। হেঁটে তিনি মহকুমা কার্যালয়ে কর্মসূচীতে যোগ দিতেন যা—আট দশ মাইল দূরবর্তী। শোভাযাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রে সবার আগে থেকে সকলকে অনুপ্রেরণা দান করতেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তমলুক কংগ্রেস কমিটিকে বে-আইনী ঘোষণা করলে ঐ থানার শ্রীরামপুর গ্রামে কমিটির সম্মেলন শুরু হয়। প্রায় বারো মাইল রাস্তা হেঁটে মাতঙ্গিনী ঐ সম্মেলনে

যাগ দেন। পুলিশ ঐ সভায় ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জেলা মহিলা কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে মেদিনীপুর সম্মেলনে যোগ দেন। মাদক বর্জন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, চরকা খাদির প্রচলন গান্ধীজী প্রবর্তিত সমস্ত কর্মসূচী তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তমলুকের ভয়াবহ বন্যায় জনজীবন বিপর্যস্ত হলে তৎকালীন মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীকুমারচন্দ্র জানার নেতৃত্বে তিনি ত্রাণ কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

দেশকে ভালোবাসা মানে দেশের মানুষকে ভালোবাসা। তাদের হিতাহিত চিন্তা করা। মানুষের জন্য রাজনীতি, রাজনীতির জন্য মানুষ নয়। এই মানবতাবাদের দীক্ষা নিতে মাতঙ্গিনীকে কোনো পুঁথি পোড়োর কাছে যেতে হয়নি, 'এথিক্যাল মাদার হুড' থেকেই তিনি যেমন সর্বজনের জননী হয়ে উঠেছিলেন তেমনি বিশেষ কোনো মতবাদের দাসত্ব না করে তিনি মানব কল্যাণের মহান ব্রত পালন করে চলেছিলেন। সেই ব্রতের সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপনের জন্য নিজেকে যেন ভিতরে ভিতরে তৈরি করছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী নির্দেশিত একক সত্যাগ্রহে গোটা মেদিনীপুর উত্তাল। তখনও দেখা গেছে মাতঙ্গিনী সত্যাগ্রহীদের সভায় সভায় ঘুরছেন এবং সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন।

অবশেষে এলো ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস। ইংরাজ কোনো মতেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী যখন মানছে না তখন গান্ধীজী সর্বাত্মক সংগ্রামের ডাক দিলেন। ইংরেজ ভারত ছাড়ো—এই স্বপ্ন সফল করতে ডু-আর ডাই কর্মসূচী। ১৫ আগষ্ট কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন সম্পর্কে আলোচনা করতে মুম্বইতে ৯ আগষ্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে অতর্কিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন আর কারান্তরালে যাওয়ার আগে প্রত্যেক ভারতবাসীকে সংগ্রামের নেতা ঘোষণা করে গেলেন। নেতৃবৃন্দের হঠাৎ গ্রেপ্তারিতে সারা ভারত অশান্ত হয়ে উঠল এবং শুরু হয়ে গেল সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্ত সর্বাত্মক বিপ্লব। যে বিপ্লবের নায়ক ভারতের সুমহান জনতা। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, ইংরাজ তুমি ভারত ছাড়ো—আসমুদ্দুর হিমাচল প্রকম্পিত হলো এই মহান ধ্বনিতে। ব্রিটিশের কড়া নজর কিন্তু মেদিনীপুরের দিকে। কারণ এঁরাই বারবার বিপ্লবকে আহ্বান করে, পথপ্রদর্শক হয়। জাপানী জুজুর অজুহাতে তারা মেদিনীপুরকে অবরুদ্ধ করেছিল। নৌকা, সাইকেল প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে রসদ মজুতের অজুহাতে শস্যাদি লুণ্ঠন করে এক নারকীয় পরিবেশ তৈরি করল ব্রিটিশ প্রশাসন। উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি হলো মেদিনীপুর বাসী। বিশেষ করে কাঁথি ও তমলুকের স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ এক বৃহত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে গোপন বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো ২৯ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টার সময়ে মেদিনীপুর জেলার গ্রাম, গঞ্জে, শহরে যেখানে যতো সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে তা তারা দখল করে নেবেন—সম্পূর্ণ অহিংস আন্দোলন পরিচালনা করে। তমলুক মহকুমার নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এলেন মাতঙ্গিনী। সিদ্ধান্ত ছিল ২৮ সেপ্টেম্বর রাত্রি থেকে সমস্ত সরকারি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের লাইন কেটে খুঁটি উপড়ে ফেলে, রাস্তা কেটে, বড়ো বড়ো গাছ রাস্তার উপর ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথারীতি সমস্ত কাজ রাত আড়াইটে থেকে তিনটার মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায়। ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী গিয়ে ধরলেন এই আন্দোলনের প্রধান দুই নায়ক অজয় মুখোপাধ্যায় ও

সতীশ সামন্ত মহাশয়কে। ''আমি এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে যেতে চাই।'' বিস্মিত অজয়বাবু মাতঙ্গিনীকে বোঝাতে লাগলেন যে কাজটি কতো কঠিন এবং কতো ঝুঁকিপূর্ণ। এই শোভাযাত্রায় তাই মেয়েদের নেওয়া হচ্ছেনা, বিশেষ করে তাঁর মতো বর্ষীয়সীদের তো নয়ই। নাছোড় মাতঙ্গিনী যখন যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন অজয়বাবু তাঁকে মিছিলের পেছনে যাওয়ার অনুমতি দেন। সেনাপতির বাধ্য সৈনিকের মতো মাতঙ্গিনী সে নির্দেশ মেনে নিয়ে অজয়বাবুকে বলেন যদি দেখি সামনের স্বেচ্ছাসেবকেরা ভয় পেয়েছে তাহলে আমি কিন্তু বড়ো একটা পতাকা নিয়ে সবার সামনে এগিয়ে যাবো—এই অনুমতি নিয়ে রাখলাম। পরবর্তীকালে জানা গেছে তিনি এই মিছিলে যোগদানের বহু পূর্বেই তাঁর যাবতীয় সহায় সম্পদ গরীব দুঃখীদের দান করে দিয়েছিলেন। আর অজয় কুমারকে বলে গিয়েছিলেন যে তিনি আর ফিরে আসবেন না। বৃদ্ধা বীরাঙ্গনার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল।

সেদিনের সকল অভিযানের মধ্যে তমলুক শহর অধিকার করার অভিযান-ই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তমলুক শহরে প্রবেশের পাঁচটি পথ। গোপন মিটিঙে সিদ্ধান্ত হয় ঐ পাঁচটি পথ দিয়ে পাঁচটি অহিংস মিছিল শহরে প্রবেশ করবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির দখল নেবে। মাতঙ্গিনী যে মিছিলের পশ্চাদ্‌ভাগে ছিলেন নেতার নির্দেশ অনুযায়ী সেই সুবিশাল প্রায় বিশ হাজার মানুষের মিছিল রূপনারায়ণ নদের দক্ষিণ তীরভূমির বাঁধের উপর দিয়ে অবশেষে শহরের উত্তর দিকস্থ দেওয়ানী আদালতের পেছনে পৌরসভার প্রশস্ত জলাশয় বান পুকুরের পাড়ে এসে বাধাপ্রাপ্ত হল ব্রিটিশের সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা। এই বাহিনীর নেতৃত্বে কোন ব্রিটিশ কমাণ্ডার ছিলেন না। তমলুকের সেকেণ্ড অফিসার বঙ্গসন্তান অনিল কুমার ভট্টাচার্য তার সরকারি কর্তব্য করতে এগিয়ে এলেন ও বার বার অভিযাত্রীদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু জনতা তাদের কর্মসূচীতে সংকল্পবদ্ধ। তারা বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করলো, ফিরে যেতে আমরা আসিনি, যে কোনো মূল্যে আদালত, শহর, দখল করে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে তবেই আমরা ফিরব। এরপর অনিলকুমার বাহিনীকে অ্যাকশন পজিশানে আনলেন ও আবারও জনতাকে সতর্ক করলেন, ''তোমরা ফিরে যাও, নইলে গুলি চালাতে বাধ্য হবো।'' সামনের স্বেচ্ছাসেবক ও সাধারণ গ্রামবাসী একটু দ্বিধান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অতো মানুষের ভীড়ে শুরু হলো ঠেলাঠেলি। পেছন থেকে মাতঙ্গিনী যখন জানলেন যে সামনের মানুষজনেরা একটু বোধহয় ঘাবড়ে গেছে, তিনি তখন-ই তাঁর সতিকর্তব্য স্থির করে ফেললেন। একজন স্বেচ্ছাসেবকের কাছ থেকে বড়ো দণ্ডযুক্ত একটি জাতীয় পতাকা কেড়ে নিয়ে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ধেয়ে চললেন সামনের দিকে। মুখে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি আর মহাত্মাজীর বাণী—ইংরাজ ভারত ছাড়ো। ডান হাতে জাতীয় পতাকা বাম হাতে শঙ্খ। বিদ্রোহী চারণ কবি মুকুন্দ দাসের সমর সঙ্গীতের বাণী যেন প্রত্যক্ষ মূর্তি ধারণ করলো—

''ভয় কি মরণে, রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।''

ছত্রভঙ্গ জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি চীৎকার করে বলতে লাগলেন, ''বন্দুক দেখে পালিয়ে যাবি, মরতে এতো ভয়? তবে এতোদিন, এতোক্ষণ ধরে শ্লোগান দিচ্ছিলি কেন?— করেঙ্গে,

ইয়ে মরেঙ্গে।— যা ফিরে যা, কাপুরুষের দল। আমি একলাই যাচ্ছি। পেছনে ফিরে চাইব না। দেখব না কেউ এল কি এল না।" বলতে বলতে সদর্পে এগিয়ে গিয়ে একেবারে সৈন্যদের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন। সৈন্যরা আবারও সাবধান করলো। তাদের উদ্দেশ্যে মাতঙ্গিনী বললেন, ''তোমাদের তো কালো চামড়া, নিশ্চয়ই ভারতবাসী। আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ছি, তোমাদেরও হবে না? ব্রিটিশ ভক্ত সৈন্যরা ব্যঙ্গ করলো এবং সাবধান করলো—একপা এগোলেই গুলি! হঠাৎ ঘটলো একটা অঘটন। লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামে চৌদ্দ বছরের এক বালক দৌড়ে এসে একজন সৈনিকের বন্দুক ছিনিয়ে নিল। পতাকা হাতে মাতঙ্গিনী সেদিকে এগিয়ে গেলেন লক্ষ্মীনারায়ণের বিপদ বুঝে। ইতিমধ্যে গুলি চালনা শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। একটি গুলি লাগল মাতঙ্গিনীর পায়ে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি, চকিতে একটি গুলি তাঁর ললাটে বিদ্ধ হলো। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে, কিন্তু জাতীয় পতাকা বুকের কাছে বজ্র মুষ্ঠিতে ধরা। ব্রিটিশ প্রভুর বশংবদ এক বীর সৈনিক সবুট লাথি মেরে পতাকাটি নীচু করে দিলো। আর শহীদ বীরাঙ্গনা, গান্ধীবুড়ি অমর হয়ে গেলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 'আইকন' হিসাবে। তাঁর সঙ্গে শহীদ হলেন, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত (৩৩), লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (১৪), পুরীমাদব প্রামাণিক (১০), জীবনকৃষ্ণ বেরা (১৮), আহতের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নি। সংগ্রামী ভারতের শহীদ রমণী লক্ষ্মীবাঈ, প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার-এর পাশাপাশি অমর হলেন মেদিনীপুরের মহীয়সী কৃষক রমণী বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা। অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে যে আত্মোৎসর্গের সূচনা করেছিলেন, সেই সংগ্রামের বাহক ছিলেন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য আর তাকে যেন পূর্ণতা দিলেন ৭৩ বছরের চিরতরুণী বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী। দেখিয়ে দিলেন, দেশকে ভালোবাসার, দেশের ভালোবাসার কোনো বয়স হয়না। বয়স কোনো প্রতিবন্ধকতা নয় আত্মদানের মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার।

২৯ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচী মাতঙ্গিনীর আত্মবলিদান ভারতের মুক্তি সংগ্রামে এক সুদূর প্রসারী কর্ম তাৎপর্য ও বিশেষত্ব বহন করে আনে। পাঁচ দিক দিয়ে আসা সরকারি প্রশাসন যন্ত্র দখলের কর্মসূচীতে আরও অনেক নরনারী শহীদ হয়ে প্রমাণ করেন, স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় নরনারী চরম দান করতে, বুকের রক্ত ঝরাতে কতখানি প্রস্তুত! চরম ভাবে আহত রামচন্দ্র বেরাকে পুলিশ পা ধরে টানতে টানতে থানার উঠোনে ফেলে রাখে। জ্ঞান ফিরলে তিনি বুলেট বিদ্ধ দেহটাকে টানতে টানতে থানা ভবনের দ্বারদেশে নিয়ে যান এবং দোরের চৌকাঠটিকে শক্ত করে ধরে চিৎকার করে উঠেন—থানা দখল করেছি, আমি থানা দখল করেছি। তার পরেই তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়। শঙ্কর আড়া পুলের উপর যে মিছিল এসে উপস্থিত হয় তার উপর পুলিশ বিনা প্ররোচনায় গুলি চালাতে শুরু করে। কয়েক জন প্রাণ হারাল, আহত অসংখ্য। তারা জল, জল বলে চীৎকার করছে। মেছোবাজারের বারাঙ্গনা সাবিত্রী বীরাঙ্গনা হয়ে জল নিয়ে ছুটে এলো, আহতদের সেবা করতে লাগল। ব্রিটিশ বীরপুঙ্গব সেপাইয়ের দল রুখে দাঁড়াল। রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরলেন সাবিত্রী। ডেকে আনলেন তাঁর সঙ্গিনীগণকে। তাদের এক হাতে জলের বালতি আর হাতে উদ্যত বঁটি। হার মানল ব্রিটিশ বাহিনী। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কয়েকজন গুরুতর আহতকে নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে সেবা করেছিলেন সাবিত্রী। নারকেলদা'র হাট থেকে যে

মিছিল এসেছিল তা গোরাসৈন্য আটকালো রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে। মিছিলের নেতা গুণধর সামন্ত ও প্রিয়নাথ জানা বিনা প্ররোচনায় বন্দী হলেন সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার তাদের ভয় দেখানোর জন্য বললেন— কে কে গুলি খাবে এগিয়ে এসো। তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলো এগার জন। চল্লিশোর্ধ প্রৌঢ়া ক্ষুদিমণি সী এলেন সবার আগে। অফিসার জানতে চাইলেন যে আজকের মিছিলে মেয়েদের আসা নিষেধ ছিল তবু সে কেন এসেছে? বীরাঙ্গনা উত্তর দিলেন তোমাদের রাজত্বে খেতেও পাইনা, পরতেও পাইনা, এ জীবন তাই মুক্তির সংগ্রামে দান করতে এসেছি। হয় গুলি করো, নয় এগিয়ে যেতে দাও। প্রচণ্ড লাঠি চার্জ করে সকলকে বন্দী করা হল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জনতা। বালকরাও বাদ যায়নি, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (১৪) পুরী মাধব (১০) বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার দাবীকে শপথের দৃঢ় অঙ্গীকারে পরিণত করে গেল। এই আত্মদানময় মহা সংগ্রামের ইতিহাস যখন ভারতবাসী জানল তখন একদিকে তারা যেমন হতবাক তেমনি দৃঢ়সংকল্প হল আত্মদানের মন্ত্রে—জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। মহকুমা শাসকের অনুমতি নিয়ে তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণ স্বামী বিশোকানন্দজী মহারাজের নেতৃত্বে তমলুক মিউনিসিপ্যাল শ্মশানে বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনীর নশ্বর দেহের সৎকার করলেন। কিন্তু মাতঙ্গিনী-মন্ত্র ততক্ষণে সঞ্চারিত হয়ে গেছে জাতির মনে ও মননে। মাতঙ্গিনীর আত্মদানের প্রেরণাকে পাথেয় করে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ ডিসেম্বর স্থাপিত হল তাম্রলিপ্ত জাতীয় স্বাধীন সরকার, জননেতা অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র সামন্ত, সতীশ চন্দ্র সাহু, বরদাকান্ত কুইতি'র নেতৃত্বে। অপর এক তরুণ তুর্কী নেতা সুশীল কুমার ধাড়া। এই সরকারকে দমন করতে সমর্থ হয়নি ব্রিটিশ সরকার। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগষ্ট গান্ধীজীর নির্দেশে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম বন্ধ হয়। ২৭ আগষ্ট সুশীল ধাড়া বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে ১ সেপ্টেম্বর থেকে জাতীয় সরকার আর কার্যকরী থাকবে না। সরকারের মুখপত্র 'বিপ্লবী' ও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ভবিষ্যৎ ভারত যুক্ত রাষ্ট্রের বীজ লুকিয়ে ছিল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কার্যক্রমে। সুনির্দিষ্ট সংবিধান, ডাক ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, পরিবহন, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা—সমস্ত দিক গুলিকে সুশৃঙ্খল ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে একদিকে প্রয়াত শহীদদের প্রতি যেমন তাদের দায়িত্ব পালন কচ্ছে তেমনি ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের রূপরেখা কেমন হবে সে বিষয়েও উপাদান ও উদাহরণ সৃষ্টি করেছে এই সরকার। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের কায়া ও কান্তি নির্মাণে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র সামন্ত, সুশীল কুমার ধাড়া প্রমুখ তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কর্ণধারগণ। জাতির জনক মহাত্মাগান্ধী—এই আত্মত্যাগের অমলিন ধারাকে স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শন করেন। ইতিমধ্যে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের উত্থান ও আন্দোলন, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছে সমগ্র ভারতবাসী। প্রসঙ্গক্রমে আর এক মাতঙ্গিনীর কথা না বললেই নয়। পুরুলিয়ার কংগ্রেস কর্মী দেবেশ্বর পালের কন্যা মাতঙ্গিনী সমস্ত রকম সামাজিক অবরোধের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মুক্তি আন্দোলনে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২ ফেব্রুয়ারি ৩০০ মানুষের সভায় নেতৃত্ব দেন এই মাতঙ্গিনী। ৪ ফেব্রুয়ারি গান্ধী দিবসে ১১০ জন মহিলা নিয়ে একটি

মিছিল সংগঠিত করেন এবং গ্রেপ্তার হন। বিচারে ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। মুক্ত হয়েই ৪ জুলাই বন্দী দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ জন মহিলাএবং ২০ জন পুরুষ স্বেচ্ছাসেবী সহ ৩০০ জন সাধারণ মানুষের মিছিল সংগঠিত করেন। কাঁথি হাইস্কুল থেকে শুরু হয়ে এই মিছিল পৌঁছয় জেল-গেটে। বন্দী দিবস জিন্দাবাদ, ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস হোক— ধ্বনি উঠল এই মিছিল থেকে। ক্রোধান্ধ ব্রিটিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে এই মিছিলের উপর। মাতঙ্গিনীকে চিহ্নিত করে মিছিল থেকে টেনে হিঁজড়ে বের করে বেদম প্রহার করা হয়। আর এক শহীদ মাতঙ্গিনী কোনোক্রমে বেঁচে যান সেদিন। না, এতে তিনি দমে যাননি বা আন্দোলন ত্যাগ করেননি। এক বছর পর সুস্থ হয়ে ঐ বন্দী দিবসে আবার তিনি মিছিল সংগঠিত করেন। এই মাতঙ্গিনী পাল যেন মাতঙ্গিনী হাজরার পূর্বসুরী। তাঁর সম্পর্কে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আশ্চর্য রকম নীরব।

মেদিনীপুরের গণ অভ্যুত্থান, তাঁদের মরণপণ ব্রিটিশ বিরোধিতা ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে এমন চক্ষুশূল হয়েছিল যে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর যে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণি ঝড় ও বন্যায় বিধ্বস্ত মেদিনীপুরের জন্য সরকার তো কোনো ত্রাণের ব্যবস্থা করলো-ই না, উপরন্তু ভারত রক্ষা আইন বলে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে পুরো খবরটাই চেপে দিয়ে মেদিনীপুর বাসীদের তারা ভাতে মারবার ব্যবস্থা করে। শুধু ব্যবস্থাই নয় এই দুর্যোগের মধ্যেও চলে ব্রিটিশ বাহিনীর অকথ্য অত্যাচার। তদের সাহায্য করতে থাকে আমাদের-ই কিছু ব্রিটিশ স্তাবক ও মেরুদণ্ডহীন সুবিধাবাদী ভারতবাসী। তথ্যানুযায়ী লুঠপাটের সঙ্গে, শ্লীলতা হানির বন্যা বয়ে গিয়েছিল এই দুর্যোগ পীড়িত মেদিনীপুরবাসীর উপর। ''১৯৪২-১৯৪৪—এই দু বছরের মধ্যে তমলুক মহকুমায় মোট ১১৬টি বাড়ী পোড়ানো হয়েছিল, তার মধ্যে ঝড়ের পূর্বে পোড়ানো হয় ৫২টি বাড়ী, ঝড়ের দিন ৬টি এবং ঝড়ের পরে ৫৮টি...'' —সর্বাধিনায়ক, পৃঃ—৪৬। এটা শহীদ মাতঙ্গিনীর আত্মদানের চরম ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া। এর বিরুদ্ধেই তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। যাঁরা শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, আর্তঘ্রাণ, দুর্ভিক্ষ-দমন প্রভৃতি কাজে দৃটোন্তমূলক দক্ষতার পরিচয় দিলেন। এখানে এই সরকারের কার্যক্রম ও সফলতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই, শুধু একটা ঘটনা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে—এই সরকারের জনপ্রিয়তা ও দক্ষতা। জাপানি জুজু আর নেতাজীর সসৈন্যে প্রবেশের ভীতি—এই দুইয়ের অজুহাতে নৌকা, সাইকেল, অন্যান্য যানবাহন কেড়ে নিয়ে বা নষ্ট করে দিয়ে সমগ্র মেদিনীপুর বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরের বন্দর অঞ্চলগুলিকে ব্রিটিশ সৈন্যের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করে ব্রিটিশ প্রশাসন ও তাদের তাঁবেদার গোষ্ঠী। ব্রিটিশের চর হয়ে এক শ্রেণির ধান্দাবাজ লোক আন্দোলন ও শান্তিপূর্ণ অহিংস অসযোগীদের নেতানেত্রী ও সমর্থকদের গোপন তথ্য ও বিপ্লববাদী আন্দোলনকারীদের ডেরা ও গোপন তথ্যের সংবাদ দিতো ব্রিটিশ পুলিশ ও প্রশাসনকে পদ ও প্রতিপত্তির আশায়। জাতীয় সরকারকে একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও সর্বহারা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জীবন রক্ষার চ্যালেঞ্জ যেমন গ্রহণ করতে হয়েছে তেমনি ঘরভেদী বিশ্বাসঘাতকদের মোকাবিলাও করতে হয়েছে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে জাতীয় সরকারের প্রশাসন ও বিচারালয় এই সমস্ত মীরজাফরদের চরম দণ্ড দিতে বাধ্য হন। জাতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ঐ সব মতলব বাজদের পক্ষে

গান্ধীজীর কাছে অভিযোগ করা হয় যে অহিংস নেতারা নাকি হিংসার আশ্রয় নিয়ে গান্ধীনীতি ভেঙেছেন।

গান্ধীজী তমলুকে এলেন, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর (মহিষাদল)।.....তিনি সতীশচন্দ্রের কাছে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে চান। সহকর্মীগণ যারা এই হিংসার কথা জানতেন তারা সবকিছু সতীশ চন্দ্রের কাছে স্বীকার করেন এবং গান্ধীজীর কাছে এ সত্য অস্বীকার করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। কারণ গান্ধীজী হয়তো এ কারণে কোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের পরিত্যাগ করতে পারেন— বলে তাদের মনে হয়েছিল। সতীশচন্দ্র একজন সত্যাগ্রহী, কোনো ভাবেই তিনি অসত্যের পথ নিতে চাইলেন না এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করতে চাইলেন। অবশেষে এই সরল অথচ দৃঢ়চেতা মানুষটির কাছে সকলকে নত হতে হলো। সতীশচন্দ্র সহ সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক সেদিন গান্ধীজীর কাছে তাঁদের হিংসাশ্রয়ের কথা স্বীকার করে কোন পরিস্থিতিতে তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন তারও বিস্তৃত বিবরণ দিলেন। গান্ধীজী সুশীলা নায়ার ও আভা গান্ধীকে দিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যে, কোনো সভ্য প্রশাসন এমন পাশবিক অত্যাচার করতে পারে? সতীশচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীরা গান্ধীজী চাইলে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে তাঁরা ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা দেবেন বলে ঘোষণা করলেন। বিচলিত গান্ধীজী সেদিন বলেছিলেন যে শত চেষ্টা করেও ব্রিটিশ সরকার তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা খাড়া করতে পারেনি। আর আমি যাবো তাদের সহায়তা করতে। আমি ব্রিটিশ সরকারের এজেন্ট? গান্ধীজী চাইলে তাঁরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যেতেও রাজী—একথার উত্তরে গান্ধীজী বলেন, আমি তোমাদের কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে বলার কে? আমি তো কংগ্রেসের চার আনার সদস্য ও নই। যে সাহস, বীরত্ব তোমরা দেখিয়েছো তার কাছে আমি নতজানু হচ্ছি, তবে পুরোটা অহিংস পথে হলে আমি আরও শান্তি পেতাম, খুশি হতাম। পরের দিন দেশদ্রোহীদের আত্মীয় স্বজনদের অভিযোগকারীদের ডেকে বলে দিয়েছিলেন— দেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।— আপনারা মনে করুন—আপনাদের বাড়ির ছেলেরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়েছেন। অহিংসার মন্ত্রগুরুকে সেদিন এই রায়-ই দিতে হয়েছিলো। এই অনুপ্রেরণার পেছনে ছিল মাতঙ্গিনী ও অন্যান্য শহীদের আত্মাদানের উজ্জ্বল স্মৃতি। ২৯ সেপ্টেম্বর যে আত্মদান দিবসের সূচনা করে গেলেন বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী ও তাঁর সহযাত্রীগণ— সেই, কার আগে প্রাণ, কে করিবে দান, তার লাগি কাড়াকাড়ি'কে সম্বল করে মেদিনীপুর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের হলদি ঘাট হয়েছে। দেশ ও মানুষকে ভালোবাসার জন্য— না বড়ো বড়ো ডিগ্রী বা পদের প্রয়োজন আছে, না প্রয়োজন আছে বয়সের সীমা— সেখানে শুধু প্রয়োজন ত্যাগব্রতী মহৎ অন্তঃকরণ। সেই মহৎ অন্তঃকরণের মহান অধিনায়িকা বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনীকে জানাই শতকোটি প্রণাম।

মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে—

জয়তু মাতঙ্গিনী।

পরিশিষ্ট-১

❑ স্বাধীন ভারতে মহীয়সী মাতঙ্গিনীর স্মৃতি নানাভাবে সংরক্ষণ করার চেষ্টা হয়েছে। তার কয়েকটি হলো—

১। তমলুক-হলদিয়া ও তমলুক-পাঁশকুড়া বাস রুটের সংযোগস্থলে তমলুক শহরের নিকটবর্ত্তী 'মানিকতলা'য় মাতঙ্গিনীর মূর্তি স্থাপন।

২। কলকাতা ময়দানের পাশে মাতঙ্গিনীর মূর্তি (রেডরোড)।

৩। নরঘাট-হলদিয়া বাসরুটে হলদি নদীর উপর মাতঙ্গিনী সেতু (রানাঘাট)।

৪। তমলুক শহরে বানপুকুরের পাড়ে যেখানে তিনি শহীদ হয়েছিলেন সেখানে স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপন।

৫। তমলুকের কাছাকাছি রেল স্টেশনের নাম।

৬। নিমতৌড়ী শহীদভবনে মূর্তি স্থাপন।

৭। তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির অফিস ভবনের কাছে স্মৃতিস্তম্ভে নাম খোদাইকরণ।

৮। আলিনান গ্রামে স্মৃতিস্তম্ভ—উদ্বোধন করেন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

৯। এ ছাড়া ঐ গ্রামে শহীদ মাতঙ্গিনী ভবন বালিকা বিদ্যালয়।

১০। শহীদ মাতঙ্গিনী জুনিয়র বেসিক স্কুল।

১১। বীরভূম শিউড়িতে মাতঙ্গিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

১২। মাতঙ্গিনী পাঠাগার— কৃষ্ণগঞ্জ, তমলুক।

❑ ৪২'এর স্বাধীনতা আন্দোলনে কয়েকজন ইংরাজ কর্মচারী ও পত্রিকা সম্পাদককেও শাস্তি ভোগ করতে হয়।

- স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক 'আর্থার মুর'কে লর্ড লিনলিথগো ও এল.এম. অ্যামেক্রি'র সমালোচনা করার জন্য পদত্যাগ করতে হয়।
- পাঞ্জাবে কর্মরত ই. পি. মুন, আই. পি. এস. মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিষয় নিয়ে সরকারের সমালোচনা করলে তাঁকে ইংলণ্ডে ফেরৎ পাঠানো হয় এবং পেনশন থেকে বঞ্চিত করা হয়।
- বিহারের গভর্ণর 'থমাস স্টুয়াট' আন্দোলন দমনে অতি বাড়াবাড়ি করার জন্য বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা নিলে, স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে তাঁকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়।

চিত্তরঞ্জন কিভাবে দেশবন্ধু হলেন তার একটি প্রাথমিক রূপরেখা

ড. সৌভিক মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) হঠাৎ করেই বেশ কিছুদিন রোগভোগের পরে ১৯২৫ সালের ৬ই জুন দেহান্তরিত হলেন। 'দেশবন্ধু' হিসাবে পরিচিতি চিত্তরঞ্জন বাংলায় তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। সাংবাদিকরা অনেকেই তাঁকে বাংলার মুকুটহীন রাজা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য বহু রাজনৈতিক নেতার ক্ষেত্রেই এই বাক্যবন্ধ ব্যবহার করা হত বা আজও হয়। হয়ত এইভাবেই ঔপনিবেশিক শাসনে পিষ্ট মানুষ নিজেদের শাসক বেছে নিত। তবে চিত্তরঞ্জনের ব্যাপার একটু আলাদা। মৃত্যুর সময় তাঁর মাথায় একই সঙ্গে তিনটে মুকুট শোভা পাচ্ছিল। তিনি একই সঙ্গে কলকাতা করপোরেশনের মেয়র, বাংলার ব্যবস্থপক সায় (Bengal Legislative Council) স্বরাজ্য পার্টির নেতা আর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। কাজেই তাঁকে বংলার মুকুটহীন রাজা বলাটা কেবল ফাঁকা আওয়াজ বা শুধুই ইচ্ছাপূরণের গল্প নয়।

চিত্তরঞ্জনের দেহাবসানের পর যে অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া সেদিন সারা বাংলায় দেখা গিয়েছিল সেটা তাঁর জনগণমন অধিনায়ক পদমর্যাদার মানানসই। তাঁর অন্যতম জীবনীকার, Bengali পত্রিকার সম্পাদক পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুদিনে দার্জিলিং-এ উপস্থিত ছিলেন। দার্জিলিং-এ এবং পরে ট্রেনে কলকাতা পর্যন্ত শবানুগমন করার সময় প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে মানুষের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন : ''মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ছোট্ট শহর দার্জিলিং-এর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শেষ দেখা দেখবার জন্য মানুষের ঢল নামলো 'স্টেপ এসাইভ'র প্রাঙ্গণে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সমস্ত বর্ণ, শ্রেণী ও জাতির লোকেরা স্বজন হারানোর ব্যথায় চোখের জল ফেলছিলেন। পরদিন, বুধবার সকাল সাতটায় ঘন নীল আকাশের তলায় শবযান সমেত কয়েক হাজার মানুষ দার্জিলিং রেল স্টেশনে এসে সমবেত হলেন। দার্জিলিং থেকে প্রতিটি স্টেশনে বিপুল জনতা তরুণ বঙ্গের এই অবিসংবাদী নেতার নশ্বর দেহকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনটি যখন নির্ধারিত সময়ের ঘণ্টা তিনেক বাদে পৌঁছল তখন স্টেশনের বাইরে অপেক্ষামান কালো মাথার এক সমুদ্র। স্টেশন থেকে শুরু হওয়া সেই শবযাত্রায় কলকাতার মেয়রকে বিদায় জানাতে সেদিন দুমাইল লম্বা শোক মিছিল চলেছিল। গান্ধিজির নেতৃত্বে প্রায় তিন লক্ষ জনতা শবযাত্রায় সামিল হয়। শেষে প্রায় ছঘণ্টা যাত্রার অন্তে

দেহ শ্মশানে এসে পৌঁছল বিকেল চারটে নাগাদ। এক পশলা বৃষ্টির মধ্যে শেষকৃত্য সম্পন্ন হল।" এই বিবরণ থেকে একটা ধারণা পাওয়া যায় যে সেদিন কেবলমাত্র কলকাতার নাগরিকরাই নয়, পাহাড়ের দেহাতি মানুষ থেকে শুরু করে গ্রাম জনপদের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই তাদের নেতাকে শেষবারের মত চোখের দেখা দেখতে রাস্তায় নেমেছিল।

দীর্ঘ পদযাত্রা এঁকে বেঁকে একটি বৈষ্ণব মন্দির, কলকাতা করপোরেশনের অফিস, রসা রোডস্থিত চিত্তরঞ্জনের বসতবাড়ি (যা তিনি ইতিমধ্যেই জাতির উদ্দেশ্যে দান করে দিয়েছেন) ঘুরে শ্মশানে পৌঁছয়। শবযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গান্ধিজি স্বয়ং। তিনি নিজেও সেই অবিস্মরণীয় পদযাত্রার বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তিনি দেখেছিলেন রাস্তার ধারে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুর নারীদের পুষ্পবৃষ্টি। এমনকি ল্যাম্প পোস্ট থেকেও সেদিন মানুষ ঝুলছিল শেষ দেখা দেখতে, শ্মশানে পৌঁছলে মানুষের ভিড়ে সেদিনই গান্ধিজির প্রাণ সংশয় হত যদি কয়েকজন বলশালী যুবক তাঁকে তাদের কাঁধে তুলে না নিতেন। চিতর আগুন প্রজ্জ্বলিত হতেই মানুষের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ভিড় এমন ভাবে চিতার কাছে পৌঁছে গেছিল যে আশঙ্কা হচ্ছিল যে বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

দু সপ্তাহ বাদে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। উত্তর ভারত থেকে সমাগত ব্রাহ্মণদের পৌরহিত্যে সমস্ত বর্ণ, ধর্মের মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর ছেলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। কলকাতা সেদিন ছুটির চেহারা নিয়েছিল। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অংশ হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক দরিদ্র নারায়ণ সেবার ভোগ গ্রহণ করেন।

এই দীর্ঘ বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে চিত্তরঞ্জন একজন অসম্ভব জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি আক্ষরিক অর্থেই বাংলার মুকুটহীন রাজা হয়ে উঠেছিলেন। কিভাবে, কোন কারণে তিনি জনচিত্তকে এই ভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কয়েকটি চাঞ্চল্যকর মামলা লড়ে তাঁর জনজীবনে প্রবেশ। এই মামলাগুলিতে তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের রক্ষা করেছিলেন। বস্তুত এই মামলাগুলির খ্যাতিই তাঁকে পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে অন্যতম সফল আইনজীবীর পরিচয় দিয়েছিল। ১৯১৭ সালে তিনি সরাসরি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আঙ্গিনায় পা রাখেন। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ভারতের সফলতম আইনজীবী উকিলের শামলা পরিত্যাগ করে পুরোদস্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, হয়ে ওঠেন বাংলার মানুষের চোখের মণি। রাজনীতিতে তাঁর এই উল্কারগতিতে উত্থানের পেছনে, দশ বছরেরও কম সময়ে (১৯১৭-১৯২৫) এই জনপ্রিয়তা অর্জনে কতগুলি আপাতগ্রাহ্য কারণ ছিল। পারিবারিক দিক থেকে তিনি ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের একটি পুরোধা পরিবারের সন্তান। পড়াশুনা প্রথমে সেযুগে বাংলার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সি কলেজ, পরে আইন শিক্ষা লন্ডনের ইনার টেম্বল এবং ইংলন্ডের বার কাউন্সিলে। তখন বিলেত ফেরত আইনজীবীকে ব্যারিস্টার আর ভারতে প্রশিক্ষিত আইনজীবী এ্যাডভোকেট বা নিছক কাউন্সেল বলার চল ছিল। আর আইনজীবী হিসাবে তাঁর বাগ্মীতার খ্যাতি তো আকাশচুম্বী। পেশাগত সাফল্য ছাড়াও তাঁর চরিত্রের আরেকটা দিক ছিল সাহিত্যচর্চা। তিনি শুধু যে পাঁচটি উঁচুদরের কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা, বেশ কয়েকটি গল্প আর প্রচুর উপাদেয়, সুচিন্তিত প্রবন্ধের লেখক তাই

নয়, এর পাশাপাশি তিনি নিজের পকেট থেকে বহু অর্থ ব্যয় করে সে যুগের অন্যতম সেরা সাহিত্যপত্র 'নারায়ণ' সম্পাদনা করেছেন বেশ কিছুদিন ধরে। একসময় অবস্থা বৈগুণ্যে বাবা এবং নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য হলেও পাওনাদারদের টাকা মিটিয়েছেন, নিজেকে পরিবারের প্রতি অসম্ভব দায়বদ্ধ সন্তান, পিতা, দাদা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বংশকৌলিন্য, পেশাগত সাফল্য, সাহিত্যকৃতী ও বৈদগ্ধ্য, বিপুল বৈভবের পাশাপাশি অকাতরে দানও তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। আবার নিম্ন মধ্যবিত্ত, দক্ষ শ্রমিক কর্মচারী থেকে চা-বাগানের কুলি — সমাজের সর্বস্তরে মানুষের মধ্যেই তাঁর বিপুল গ্রহণযোগ্যতা ছিল। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি বহু তরুণ প্রতিভাবান কর্মীকে (বীরেন্দ্রনাথ শাসমল থেকে সুভাষচন্দ্র বসু) রাজনীতির আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আদালত কক্ষে অথবা জনজীবনে যেভাবে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা শ্বেতাঙ্গদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিতেন সেটাও দেশবাসীর কাছে আত্মশ্লাঘার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে ইংরেজ সরকারের 'দ্বৈত শাসন' বানচাল করেছেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বারেবারে নাকাল করেছেন বুদ্ধিমত্তার সাথে, কলকাতা কর্পোরেশনকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন — তার মধ্য দিয়ে অবশ্যই তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯১৯-র পর গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নবগঠিত কংগ্রেস সংগঠন, মন্টেও-চেমসফোর্ড আইনের ভিত্তিতে কিছুটা বর্দ্ধিত নির্বাচক মণ্ডলীর ভোটে নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রণীত নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে গঠিত আর্থিক ভাবে কিছুটা স্বনির্ভর কলকাতা করপোরেশন—এই সবই তাঁর ক্ষমতা ভিত্তি এবং জনপ্রিতয়ার এক স্তম্ভ।

কিন্তু এসব বাহ্য এবং আপাতগ্রাহ্য কারণগুলির বাইরেও আর একটি উল্লেখযোগ্য সময় (১৯০৫-১১) কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন এবং সংকটেরও জন্ম দিয়েছিল। আন্দেলন চলাকালীন জ্বলে উঠেছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন। পারস্পরিক দোষারোপকে পাশে সরিয়ে রেখে রবীন্দ্রনাথের সেই অমোঘ উক্তি, 'মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইলো সেটা তত গুরুতর নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে।' বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। দ্বন্দ্বের সূত্রপাতমূলত উচ্চ বর্গীয় হিন্দু জমিদার, মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সঙ্গে মুসলমান, নমশূদ্র কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত; শিক্ষাজগতে কর্মক্ষেত্রে মুসলমানের প্রবেশাধিকারের প্রশ্নে বাঙালী 'ভদ্রলোক'দের ওজর আপত্তি। আরেকটা প্রশ্ন ছিল প্রাদেশিক কংগেসের আঙ্গিনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের অংশীদারীত্বের। চিত্তরঞ্জন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উষালগ্নেই এইসব অসীমাংসিত প্রশ্নগুলির সুসংবদ্ধ উত্তর দিয়েছিলেন। অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল (ক) বাঙ্গালী কারা (খ) তাদের ভবিতব্য কি? বস্তুত এই সব প্রশ্নের উত্তরগুলিই ছিল পরসপরের পরিপূরক। চিত্তরঞ্জনের উত্তরের অনন্যতা জনচিত্ত আকর্ষণ করেন। তিনি ক্রমেই জনগণমন অধিনায়ক হয়ে ওঠেন।

উপরোক্ত কঠিন এবং জটিল প্রশ্নের উত্তর পেতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দলিলটি হল ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে

তাঁর ভাষণ। সম্ভাষণটি 'বাংলার কথা' শিরোনামে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়। বক্তৃতার শুরুতে বাংলার, বাঙালীর রাজনীতি চর্চার দোষত্রুটিগুলি নিপুণ দক্ষতায় নির্ণয় করবার পর রোগমুক্তির নিদান বাতলে দিয়েছেন অভিজ্ঞ ডাক্তারের ভঙ্গীতে। বক্তৃতার ব্যাপ্তি ও গভীরতার কারণে সমকালে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি অচিরেই প্রাদেশিক ও জাতীয় রাজনীতির পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলার রাজনীতির বেতাজ বাদশা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বদেশী আন্দোলনের ঝাপটায় সে আসন কিছুদিনের জন্য টলমল করলেও কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশরে পর (১৯০৮) কংগ্রেস থেকে চরমপন্থী নেতাদের বহিষ্কারের পরে, মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারের (১৯০৯) মধ্য দিয়ে রাজনীতি আবার আবেদন-নিবেদনের গড্ডল স্রোতে ফিরে যায়, সুরেন্দ্রনাথও তাঁর প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। বিপ্লববাদী আন্দোলনের উত্তেজনা, মজফ্ফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা, চাঞ্চল্যকর আলিপুর বোমার মামলার চিত্তচাঞ্চল্য কিছুদিনের মধ্যেই জনগণের স্মৃতি থেকে মুছে যায়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে (১৯১৪-১৯) উদ্ভুত বিশ্ব পরিস্থিতি, যুদ্ধের অভিঘাতে সামগ্রিক পরিস্থিতির দ্রুত বদল ঘটতে থাকে। ১৯১৬-র সমঝোতায় চরমপন্থীরা আরও একবার কংগ্রেসের আঙ্গিনায় ফিরে আসেন। ওই বছরই মুসলিম লিগের সাথে জাতীয় কংগ্রেসেরও একটা সমঝোতা হল; একদিকে অ্যানি বেশান্ত অন্যদিকে 'লোকমান্য' তিলকের নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলন শুরু হলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতে একটু একটু করে প্রাণের লক্ষণ দেখা দেয়। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনেই (১৯১৭) সুরেন্দ্রনাথ ও মডারেট নেতৃত্বের মনোনিত প্রতিনিধির পরিবর্তে চরমপন্থীরা অ্যানি বেশান্তকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসের সভাপতি করতে সক্ষম হন। এই সময় থেকেই বাংলা তথা ভারতে সুরেন্দ্রনাথ মার্কা রাজনীতি পিছু হটতে শুরু করে।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জনের 'বাঙ্গলার কথা' এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলো। চিত্তরঞ্জন বাংলার রাজনীতির সংকট ও প্রতিকারের যে রূপরেখা এখানে তৈরি করলেন তার তাৎপর্য বুঝতে রাজনীতির এই সমসাময়িক প্রেক্ষিত মাথায় রাখা জরুরি। তবে চিত্তরঞ্জনের এই ভাষণকে কোনভাবেই সংকীর্ণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আতস কাঁচ দিয়ে দেখা উচিত নয়। আবার একই সঙ্গে এটাও ঠিক যে ভাষণটির সমকালীন প্রাসঙ্গিকতাই হয়ত তার সার্বজনীন, দীর্ঘমেয়াদি আবেদনকে সংহত করতে সাহায্য করেছে।

বক্তৃতার গোড়ায় রয়েছে রাজনীতির নামে সুরেন্দ্রনাথ মার্কা প্রচলিত পন্থার তীব্র সমালোচনা — যা মূলত পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বা অনুপ্রেরণায় তৈরী। 'রাজনীতি বা politics শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলন্ডে গিয়া পৌঁছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্ত্তিরই অর্চনা করিয়া থাকি। ... Burke এর বুলি যাহা স্কুলে ও কলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই, Gladstone-এর কথামৃত গান করি আর মনে করি ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম। [....] Sidgwick-এর কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি, ফরাসী স্কুল, জার্মান স্কুল এবং ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে, কোরাণে যত ধারাল বাক্য

আছে একেবারে এক নিঃশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি, এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন।' 'মনে করি রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয় —বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। [...] শুধু যাহা আবশ্যক, তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না, [...] কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই।'

পাশ্চাত্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী রাজনীতি হল রাজা ও প্রজার সম্পর্কের বিচার। রাজ্যকে সৎভাবে পরিচালনা করবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তার কতটা রাজার হাতে আর কতটা প্রজার হাতে থাকবে সেটা নির্ণয় করা দরকার। কিন্তু সেটা করতে গেলে সবার আগে জানা দরকার দেশের আর্থিক অবস্থা কেমন, কৃষির, কৃষকের হাল কেমন; গ্রাম ছেড়ে লোকে দলে দলে শহরে চলে যাচ্ছে কেন; অস্বাস্থ্যের কারণে কিনা — এমন অনেক প্রশ্নের সমাধান। এছাড়া ব্যবসাবাণিজ্যের পরিস্থিতি বর্তমানে কেমন আছে, আগে কেমন ছিল; শিক্ষা দীক্ষার হাল কেমন সেগুলো জানা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সমাজের কি সম্বন্ধ ছিল, তাতে কি উপকার বা অপকার হয়েছে সে সবও জানা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি সকল চেষ্ট ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে সেটা বিচার করাও কর্তব্য। অর্থাৎ রাজনীতিকে পশ্চিমা রীতি অনুযায়ী একটি আলাদা প্রকোষ্ঠে বন্দী না করে তাকে জীবনের সমগ্রতার অংশ হিসাবে চিত্তরঞ্জন দেখতে আগ্রহী ছিলেন।

এক অর্থে দেশে তখনো পর্যন্ত চালু নরমপন্থী রাজনৈতিক কর্মসূচীর এ এক মর্মভেদী সমালোচনা। সুরেন বাঁড়ুজ্জে মার্কা রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতাকে এই ভাষায় আক্রমণ কম লোকই করেছেন।

তবে এই জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতির সূত্রপাত হয়েছে একটি সংশ্লিষ্ট কারণে। চোস্ত ব্রিটিশ কায়দায় ইংরেজি বলা মুষ্টিমেয় মেকলের শহুরে সন্তান সন্ততিদের শিক্ষার অহংকার— 'আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহংকার করি, আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয়জন? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের কোথায় যোগ? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীদের সেরূপ আস্থা নাই? কেন নাই?... আমরা যে ইংরাজী পড়ি ও ইংরাজীতে ভাবি এবং ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া বাঙ্গলা বলি ও লিখি তাহারা যে আমাদের কথা বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে নকলের চেয়ে আসলই ভাল।' ভাষার ব্যবধান, মানসিকতার তফাৎ রাজনৈতিক নেতা আর দেশের আপামর জনগণের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়ে তুলেছে। সবচেয়ে বড় কথা ইংরেজের নকলনবিশি রাজনৈতিক নেতাকে সাধারণ মানুষের কাছে সন্দেহভাজন করে তুলেছে। আর তারা বিশ্বাস করবেই বা কেন?! 'Governemnt-এর কাছে কোনও আবেদন করিতে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া একটা বিরাট সভার আয়োজন করি। কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি? আমাদের কোন্ কমিটিতে, কোন্ সমিতিতে চাষা সভ্য-শ্রেণীভুক্ত?' কেন এমন হল? হয়ত কিছুটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। যে সময়ে ভারত ইংরেজের বশীভূত হল সে সময় একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র মৌখিক আবৃত্তির

মধ্যে আপামর শিবশক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপরদিকে যে অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্ম বলে মহাপ্রভূ সমস্ত বাঙ্গলাদেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেম ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র তিলক কাটা ও মালা ঠক্‌ঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল।' [...] আলিবর্দ্দি খাঁর পর হইতেই বাঙ্গলার মুসলমানও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাপে ভাসিয়া গিয়াছিল।' এই সংকট মুহূর্তেই ভারতে বণিকবেশী ইংরেজের সাম্রাজ্য স্থাপন। অনিবার্য ভাবে 'দুর্ব্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল। ইংরাজী সভ্যতার প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম।' এরপর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে 'জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিলাম।'

তবে এর মাঝখানে প্রাণের সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল বইকি— 'বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালার মূর্ত্তি গড়িলেন — প্রাণ — প্রতিষ্ঠা করিলেন'। যদিও সেই সময় তিনি খুব একট সমর্থন পান নি। এরপর শশধর তর্কচূড়ামণির নেতৃত্বে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন। এই বিশেষ আন্দোলন নিয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে কিন্তু এর মধ্যে বাঙ্গালী জাতির, অন্ততঃপক্ষে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস, একটা উদ্যম দেখিতে পাই। তারপর এল স্বদেশী আন্দোলন। জলোচ্ছাসের প্রাবল্যে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সেই মহাপ্রলয়ে আমরা ডুবে বেঁচেছি। 'বাঙ্গলার যে জীবন্ত প্রাণ তার সাক্ষাৎ পাইয়াছি।' তারই প্রণোদনায় বাংলার ইতিহাসের ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির মত পদকর্তা, কবিওয়ালা, রামপ্রসাদের গানে প্রাণ ভরে উঠলো। এই প্রবাহের মধ্যে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জনের মত মানুষের আত্মোপলব্ধি হল— 'এই জগতের মধ্যে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, কর্তব্য আছে। বুঝিলাম বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। [...] যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। তোমরা হিসাব করিতে চাও কর — আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।' বঙ্কিমের প্রবল অনুরাগী চিত্তরঞ্জন সচেতনভাবেই তাঁর ভাষণের শীর্ষক রেখেছিলেন 'বাংলার কথা' আর সেখানে রাজনৈতিক কচকচির আগে রেখেছেন দেশ ও দেশের সংস্কৃতির প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসাকে। দেশ, দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি, রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে দেশবাসীকে ব্যবহার করা নয়, এস আন্তরিক উপলব্ধিই তাঁকে তৎকালীন সমস্ত রাজনীতিবিদদের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল

জন্মভূমির প্রতি ভালবাসার শক্ত ভিত্তির রাজনীতিকে স্থাপন করতে পারলেই সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের বিষবৃক্ষকে উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে কারণ 'বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে।'

তবে চিত্তরঞ্জন তাঁর এই ভাষণে যে কেবলমাত্র সাহেবি কেতাদুরস্ত, জনবিচ্ছিন্ন মডারেট মার্কা রাজনীতির সমালোচনা করেছেন এমনটা নয়। তিনি একই সাথে বাংলার অনন্য সাংস্কৃতিক আইকন রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতার ধারণাকেও দায়রায় সোপর্দ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভৎসা ইউরোপের অনেক সংবেদনশীল মানুষের মতই রবীন্দ্রনাথকেও জাতীয়তাবাদের ধারণার প্রতি সন্দিহান করে তুলেছিল। তিনি জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ ধারণার প্রতি তাঁর আপত্তির কথা

বিশ্বের দরবারে সোচ্চারে ব্যক্ত করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় একের পর এক দেশাত্মবোধক গান লিখে, গেয়ে আপামর বাঙালীকে মাতিয়ে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের এ হেন ডিগবাজি খাওয়া যে আদ্যন্ত দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জনের পছন্দ হবে না, সে তো বলাই বাহুল্য। 'এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ — এবার আমেরিকায় এই মতটি নাকি খুব জোরের সাথে জাহির করিয়াছেন। [...] সেই মতের, এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির এই মহাসভায়, সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।' স্যার রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় বলিয়াছেন যে জাতির বদলে একটা Universal brotherhood of mankind হইবে অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতি ভ্রাতৃভাবে একত্র হইবে।' 'আমি এই বিষয়ে যতই চিন্তা করি, ইহার কোনটাই একেবারে সত্য নয়।' তীক্ষ্ণ শ্লেষের সুরে বলেছেন 'এই সমস্ত মতটাই বস্তুহীন, বিশ্বমানবের ছায়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে এই ভ্রাতৃভাব অসার কল্পনামাত্র। জাতি তুলিয়া দিলে বিশ্বমানব দাঁড়াইবে কোথায়?

বাঙালীকে তাই তার শিকড়ের সন্ধান করতে হবে তার নিজের মাটি জলের মধ্যে। বাঙালীর জাতিত্ব কি বিদেশ থেকে আমদানী করা ধারণা? চিত্তরঞ্জন এর উত্তর দিয়েছেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায়— 'বিজ্ঞান জগতে যে বড় বড় সত্য আবিষ্কার হইয়াছে, সে সব সত্যই যে সনাতন — তাহাদের সত্ত্বা বা অস্তিত্ব ত কোন বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানবিদের উপর নির্ভর করে না? মাধ্যাকর্ষণ যেমন নিউটনের জন্মাইবার আগেও ছিল, আমাদের জাতিত্ব তেমনি ইংরাজ আসিবার আগেও ছিল। আমরা দেখিতে পাই নাই বলিয়া যে ছিল না তাহা নহে। ...আমাদের নবজাগ্রত বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব, তাহা আমাদের প্রাণবস্তু, বিদেশের নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভগবৎ কৃপায় আমাদেরই মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি — তাহাকে ধার করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার করিয়া লইয়া আসি নাই। চিত্তরঞ্জন 'বাংলার কথা'তে তাই একদিকে সুরেন্দ্রনাথের মত প্রতিনিধিত্বমূলক 'নরমপন্থী' রাজনীতি, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের স্থানে আন্তর্জাতিকতা প্রতিস্থাপনকে তুলোধনা করেছে। কিন্তু শুধু তত্ত্বকথা নয়, জাতীয়তাবাদকে দেশের প্রাণবস্তুর সাথে সংযুক্ত করতে, গ্রামবাংলা এবং শহরের মধ্যে তৈরি হওয়া দুর্লঙ্ঘ ব্যবধানকে অতিক্রম করবার পথ নির্দেশিকাও ছিল এই ভাষণে সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে বাংলায় গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ — যার সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ দরিদ্র মুসলমান, চণ্ডাল (নমঃশূদ্র) সম্প্রদায়ের, আর শহুরে বৃত্তিজীবী এবং জমিতে বিভিন্ন স্বত্ত্বভোগী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ — এককথায় 'ভদ্রলোক'র মধ্যে ভেদরেখা ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুর্বলতম জায়গা — আক্ষরিক অর্থে Achilles hut রবীন্দ্রনাথ একেই তাঁর প্রবন্ধে শনি প্রবেশের ছিদ্রপথ হিসাবে শনাক্ত করেছিলেন। অন্যান্য 'চরমপন্থী' নেতাদের সঙ্গে এখানেই চিত্তরঞ্জনের তফাত। 'বাঙ্গলার কথা'য় তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের ভূত ছাড়ানোর কথাই বলেছেন কারণ এই ভূতের বেগার খাটতে গিয়েই ছেচল্লিশ লক্ষের মধ্যে চল্লিশ লক্ষ বাঙালী — যারা দারিদ্রের নির্মম পেষণ সত্ত্বেও তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি, কৃষ্টিকে ত্যাগ করে নি, যাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইংরেজি সভ্যতা, আইন আদালত দুর্নীতিগ্রস্থ করে

তুলতে পারে নি, তারা পর হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে নারায়ণ রূপে শনাক্ত করলে, গ্রামের লক্ষ লক্ষ গরীব, দুঃখী — তারা খৃষ্টান, মুসলমান, চণ্ডাল যাই হোক না কেন, ভাই হিসাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেই একমাত্র বঙালীর রাজনৈতিক প্রচেষ্টা সফল হবে।

সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে কেবল বৃত্তিজীবীর সংকীর্ণ স্বার্থ নয়, গ্রাম জনপদের সমস্যা মোকাবিলায় গণআন্দোলনমুখী সংগঠন গড়ে তোলার এই দিক নির্দেশিকা তাই সেদিন চিত্তরঞ্জনকে এক লহমায় অন্য সব রাজনৈতিক নেতাদের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। এই দিকনির্দেশিকার বাস্তব রূপায়ণের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই চিত্তরঞ্জন আগামী দশ বছরেরও কম সময়ে বাংলার বেতাজ বাদশা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ড তাই আসলে একটা ‘হয়ে ওঠার গল্প’, একটা প্রক্রিয়া।

তথ্য ঋণ ঃ

১. মণীন্দ্রনাথ দত্ত, হারাধন দত্ত (সম্পা.), দেশবন্ধু রচনাসমগ্র, ১৯৬৩, কলকাতা দুই খণ্ড।

২. Paul Greenough, 'The Death of an Uncrowned King - C. R. Das and Politcl Crisis in Twentieth Century Bengal' in Comparative Studies in Society and History, Vol 28, No. 3 (July, 1986) pp 414-441.

৩. Chittaranjan Das, India for Indians (Speeshes, Oct 1917-Feb, 1921) Edn Madras.

৪. Mohandas Karamchand Gandhi, Collected Works Vol. 27, 1968

Gandhi as Mahatma in the Twenty-first Century

Professor Rajsekhar Basu

Department of History, University of Calcutta

In the early decades of the twentieth century, as we look back and try to evaluate Gandhi's failures and successes, we often remain a confused lot. The problem arises from the fact that he lived through both troubled and unpredictable times, coinciding with the authoritarianism of fascist leaders, obdurate communist leaders and diabolical colonial regimes. Undoubtedly, Gandhi was aware of these very disturbing trends but he remained steadfast in his goal of establishing *swaraj* which was simply not geared towards freedom, but towards addressing a whole lot of issues which were part of the quotidian experiences of the poor, the powerless and above all women who were the most discriminated segment of the Indian society, both *swaraj* and *satyagraha* were the two most important ideological tools for addressing communal and sectarian fissures, conflicts over divided identities and that of racial and other sectoral forms of violence and discrimination. Despite, the growing criticism over Gandhi's methods and practices there is little doubt that Gandhi has survived and will continue to survive as long as injustice, exploitation and discrimination rule the minds of the people who are in power. Gandhi in his afterlife has continued to be a beacon of hope for underprivileged and discriminated humans throughout the world. Indeed, this has been the case, because Gandhi in the mould of an organic thinker had a holistic version of social, political, economic and cultural issues, which had been born out of his own experience of leading mass movements in South Africa and India. As a diehard critic of imperialism, Gandhi felt that the suffering of humanity under extreme authoritarian conditions did not really bifurcations in the thought process. But,while he believed in the liberation of the individual it is not too certain whether he would have accepted the hegemonic and muscular state systems, that evolved in the post- second world war years in the name of nation-states. In all probability, Gandhi

might have been repelled by these ideas which to him might have meant curtailment of individual freedom and a legitimised anarchy in the name of an order state trying to be an umpire controlling the dissent and conflict among the different sections of the citizens. However, after his demise, which came rather soon following the despair and euphoria over partition and independence, Gandhi came to be increasingly appropriated by the nascent Indian nation-state for strengthening the foundations of its own political legitimacy. But in the process, the state advertently or inadvertently pushed many of Gandhi's own fundamental premises to oblivion. The result was that Gandhi despite being revered was transformed into a saint like figure with utopian philosophical visions which had hardly much in common with the material interests of the Indian nation-state. What remained was essentially a lip service for Gandhi and an all-out replacement of Gandhi's quest for simplicity by overarching forms of modernity. But more importantly, what remained a costly miss on the part of the global community, was the erasure of the tradition of dialogue that was present in Gandhi's ideas about governance and human emancipation. The neglect of these philosophical aspects of Gandhi's ideas has made regimes throughout the world, irrespective of their ideological orientations to settle for more power and authority, rather than emphasizing on the sharing of experiences between different social groups. The end result of this all has been growing conflicts resulting from a competition over resources and aspects of life.

There can be no doubt, that despite the criticism and cynicism of Gandhi's ideas and his methods, Gandhi has continued to retain his popularity as a politician and a thinker because of his ability to look far ahead of his times. In fact, there are many in the present generation who feel that Gandhi's idea of non-violence, truth and non-possession are much more relevant for today's world than it has ever been before. The disenchantment over arms race, big power rivalry and the prospects of empire striking back and the increasing incidents of racial violence including that of caste discrimination have influenced many to turn back to Gandhi's ideals and philosophy. Gandhi can no longer be singularly labelled as a utopian, more because of the fact that his ideas can make the civil society rethink about launching new social movements against all forms of exploitation and that of development induced injustices on innocent humanity.

The relevance for Gandhi perhaps lies in his own personality, reflected in his efforts to lucidly define the connectivity's between the past and the present. The greatest quality, that Gandhi had, was his ability to adopt and

comprehend the meanings of change and this turned him into a philosopher who rather than being irrelevant could be somewhat omnipresent. It is doubtful whether Gandhi on his own wanted him to be recognised as a philosopher of great acclaim, because he felt that the greatest service that he could render to mankind was that of standing close to them and fight the inequalities based on truth. Gandhi also believed that it was not enough to philosophise, but it also had much to do with action. There is now an increasing realization among scholars that Gandhi should be seriously taken as a political thinker. His ideas, it is believed, are based on strong philosophical and conceptual foundations. In contemporary times as some scholars have tried to identify Gandhi as a philosopher politician, the reason behind such interpretation is that Gandhi adopted a holistic perception when dealing with issues of imperialism, non-violence and anti-colonial struggle under a rubric of a single platform, that was nothing other than humanity and its quest to survive the dynamics of changes. Despite being shunt by policy planners in India as well as in parts of the west for being anti-diluvian in perception sometimes is in the limelight especially when social upheavals tempt to tear apart the credibility of the nation-state. It is under such conditions that the defender of the state realise how important it is for them to rake up Gandhi as social umpire. For instance, both in the case of United States and South Africa, where there were long histories of coloured discrimination, white oppressive ruling regimes could realise the potentialities of the social philosophy of Gandhi. Gandhi undoubtedly was looked upon as the founder of a "new social gospel movements" which did not begin with the evocation of Christ in tatters but on non-violence and pacifism.

Gandhi's ideas about *swaraj* and *ramrajya* have been debated at late in the past decades. But, often there have been a pronounced rancour towards Gandhi's ideas. Both the terms have people in the centre and they are overtly linked to matters of governance and welfarism. A careful perusal would lead us to the idea that the individual in most cases merges with the collective ofindividuals to lend legitimacy to political authority. Gandhi reaches the high point as a philosopher, when he argues that the main task is to transform the social communities into self-sufficient units in matters of governance and economy. In brief, it needs to be argued that Gandhi as a philosopher believed in decentralization, which could only be achieved through a meaningful democracy, where people enjoying full freedom could decide on the agency regarding matters of political control. This perhaps could only happen in an alternative democracy, where men were freed from all

forms of exploitation and non-violence was the central feature of the state's functioning. The relevance for Gandhi therefore, assumes a greater dimension when we try to understand the reasons responsible for the growing interests on participatory and substantive democracy, which are often viewed as conduits through which the poor can not only reveal themselves economically, but also raise themselves politically.

—

Published by : The Registrar, Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 &
Printed by : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006